Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ বাশিরুন্নাহার

রোলঃ 23090121215

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ বাশিরুন্নাহার

রোলঃ 23090121215

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম। " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ বাশিরুন্নাহার, আইডিঃ 23090121215 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম। " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোছাঃ বাশিরুন্নাহার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছাঃ বাশিরুন্নাহার

আইডিঃ 23090121215

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ইসলাম কেন সত্যধর্ম?.....5

১. অক্ষরজ্ঞানহীন নবীঃ.....5

২. অপরিবর্তনীয় কুরআনঃ.....6

৩. কুরআনের চ্যালেঞ্জ: 6

৪. বৈসাদৃশ্যহীন কুরআন :.....11

৫. কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণঃ.....12

ইসলাম কাদের? :.....13

মুসলমান কাদের জন্য?.....18

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া মানবতার দাবি.....20

ইসলাম কি?.....21

তাওহীদ :.....27

তাওহীদের গুরুত্ব: 29

সর্বশেষ নবী স:.....32

সলাত.....35

সালাতের রোকনসমূহ:.....36

সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব:.....40

সাওম.....42

সাওম-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা.....42

আদর্শ সমাজ গঠনে রোযার ভূমিকা.....44

রোযার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব: 46

যাকাত.....48

যাকাতের পরিচয়.....48
যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব.....51
হজ্জ:.....55
যার উপর হজ্জ ওয়াজিব : 58
হজ্জের গুরুত্ব:.....59
পর্দা:.....62
পর্দার সামাজিক গুরুত্ব: 65
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা: 70
"ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।'.....77
স্বাস্থ্য সচেতনতায় ইসলাম:.....81
আল কুরআন থেকে কিছু কথা - 82

ইসলাম কেন সত্যধর্ম?

১. অক্ষরজ্ঞানহীন নবীঃ

মজার ব্যাপার হলো, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক একজন মানুষ। তিনি জীবনে একটুও লেখাপড়া করেননি। যদি লেখাপড়া করতেন, তাহলে মনে করা যেত যে, তিনি চেষ্টা করে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের শব্দগুলোর ভাবধারা কত যে তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলে শেষ করা যাবে না। স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, তোমরা আমার দেওয়া কুরআনের একটি আয়াতের কোনো একটি বিষয়ের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে কলম ধরো। আর এক্ষেত্রে যদি সাগরের সব পানিকে কালি বানাও, তবুও আমার একটি নেয়ামতের কথা বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। যারা গবেষণা করেছেন, তারা এর সত্যতা খুঁজে পেয়েছেন। তারা এর কোনো একটি বিষয়ে বর্ণনা করে শেষ করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও পারবেন না। কারণ, পবিত্র কুরআনে এমন সব কথা বলা হয়েছে, আর এমন সব কথার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হচ্ছে। কোনো নিরক্ষর মানুষের পক্ষে নিজ ভাষাকে দু'ভাগে ভাগ করে কুরআন ও হাদীস বলে সাজানো কখনো সম্ভব নয়। অতএব, কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত মহাগ্রন্থ। তিনিই আল্লাহর প্রকৃত নবী। আর তাঁর হাদীস তাঁর নিজস্ব ভাষা ও শব্দচয়ন- এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ জাতীয় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের জবান থেকে যদি এ রকম কিছু বের হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। মহান আল্লাহ বলেছেন-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থাৎ, ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম।'
(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৯)

সুতরাং এটাই একমাত্র সঠিক ধর্ম। আর বাকিগুলো যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রকৃত ধর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই সত্যধর্ম হলো আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামই। আর সে ধর্মের মূল্যবান বাণী হলো, মুহাম্মদ (স)-কে মহান আল্লাহ শেষ নবী হিসেবে ঘোষণা প্রদান। তাই তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার মধ্যে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত আছে।

২. অপরিবর্তনীয় কুরআনঃ

পবিত্র কুরআন এমন একটি গ্রন্থ, যা চিরকাল অপরিবর্তনীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের অবকাশ নেই। কুরআন যেমনি নাজিল হয়েছিল ঠিক তেমনি রয়েছে এবং চিরকাল তেমনিই থাকবে। প্রায় পনেরো শত বছর কাল অতিক্রান্ত হলেও এর একটি শব্দ বা বর্ণও রদবদল হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত রদবদল হওয়ার কোনো আশঙ্কাই নেই। এছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় নেই। সবগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল কত বার বিকৃত হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সুতরাং ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ এবং মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, কুরআনের নির্ভুলতা ও পরিবর্তনহীনতাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

৩. কুরআনের চ্যালেঞ্জ:

পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে সে যুগের মানুষেরা বার বার বলতে চেষ্টা করেছে যে, এটা আল্লাহপ্রদত্ত কোনো গ্রন্থ নয়; বরং এটা মুহাম্মদের নিজের বানানো কথা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, এটা মুহাম্মদের নয়; বরং এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। মানুষের পক্ষে এ জাতীয় কুরআন রচনা করা একেবারেই অসম্ভব। আবার কেউ কেউ বলেছে, তিনি জাদুকর, গণক, পাগল, কবি! কত ধরনেরই না কুৎসা রটনা করেছে!! সর্বশেষ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

অর্থাৎ, আমার নবী নিজের থেকে কোনো কথা বলেন না, যা বলেন তা আমার অহী ছাড়া আর কিছুই না।

(সূরা আন-নজম: আয়াত ৩-৪)

একথা বলার পরও যখন তারা মানতে রাজি না, তখন তিনি বলেছেন, আরবের বড় বড় পণ্ডিতগণসহ সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করে একটি ছোট্ট সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো।

সূরা ইউনুসের ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ من دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থাৎ, তারা কি একথা বলে যে, নবী নিজেই এটা রচনা করেছেন? বলো, তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে এর অনুরূপ একটি সূরা

রচনা করে আনো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকতে পার সাহায্যের জন্যে ডেকে নাও।"
(৩. সূরা ইউনুস: আয়াত ৩৮)
আল্লাহর চ্যালেঞ্জ দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকল। তাদের পক্ষে তার মোকাবিলা করা সম্ভব হলো না; বরং তারা বহুদিন পর এক রাতের আধারে গোপনে কাবার দেয়ালে লিখে দিল- لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ অর্থাৎ, এটা কোনো মানুষের বানানো কথা নয়।

এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে এটা কার বাণী? যখন তারা একটি সূরা বা সূরার কিয়দংশও রচনা করতে ব্যর্থ হলো, তখন আর বুঝতে বাকি থাকল না যে, নিশ্চয় এটা মহান আল্লাহর বাণী। এ চ্যালেঞ্জ এখনো শেষ হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তবে এটাও সত্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত এর ছোট একটি সূরা বা সূরার কিয়দংশও কেউ রচনা করতে পারবে না। সুতরাং বোঝা যায়, এটাই আল্লাহর বাণী। অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই যে, এটা সত্যগ্রন্থ। কুরআন যেহেতু সত্য গ্রন্থ, তাই এ গ্রন্থে আল্লাহ পাক যত কথা বলেছেন, যুক্তিযুক্তভাবে সবই সত্য। আর এ গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থাৎ, ইসলামই একমাত্র আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম।
(আল কুরআন থেকে সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৯)

সূরা হূদ-এর ১৩ নং আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে-
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ
অর্থাৎ, এরা কি বলছে, নবী নিজেই এ কিতাবটি রচনা করেছেন? বলো ঠিক আছে, তা-ই যদি হয়, তাহলে এর মতো দশটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর যেসব মাবুদ আছে, তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারলে ডেকে নাও, যদি তোমরা (তাদেরকে মাবুদ মনে করার ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাক।'
(সূরা হুদ: আয়াত ১৩)

এখানে এ যুক্তির মাধ্যমে কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আবার একই সঙ্গে তাওহীদের প্রমাণও দেওয়া হয়েছে। এ যুক্তির সারনির্যাস নিম্নরূপ-

ক. তোমাদের মতে যদি এটা মানুষের বাণী হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এমন বাণী রচনার ক্ষমতা মানুষের থাকা উচিত। কাজেই কেউ যদি দাবি করে যে, এ কিতাবটি মুহাম্মদ (স) নিজেই রচনা করেছেন, তাহলে দাবি কেবল তখনই সঠিক হতে পারে, যখন তারা এমন একটি কিতাব রচনা করে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু বার বার চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পরও যদি সবাই মিলে নজির পেশ করতে না পারে, তাহলে একথা সত্য যে, মুহাম্মদ (স) এ কিতাবের রচয়িতা নন; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই এটা নাজিল হয়েছে।
খ. এ কিতাবে যেহেতু অন্যান্য মাবুদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা হয়েছে এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের ইবাদত-বন্দেগি করো না। কারণ, আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় তাদের কোনো অংশ নেই। তাই অবশ্য তোমাদের মাবুদদের (যদি সত্যিই তাদের কোনো শক্তি থাকে,) আমার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করা এবং এ কিতাবের নজির পেশ করার ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য উচিত। কিন্তু ফয়সালার সময়ও যদি তারা তোমাদের সাহায্য না করে এবং তোমাদের মধ্যে এ কিতাবের নজির পেশ করার মতো শক্তি সঞ্চার করতে না পারে, তাহলে এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, তোমরা তাদেরকে অযথা তোমাদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছ। মূলত তাদের মধ্যে কোনো শক্তি নেই। আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কোনো অংশও নেই, যার ভিত্তিতে তারা মাবুদ হওয়ার সামান্যতম যোগ্যতা লাভ করতে পারে।

আরেকটু বিস্তারিত বললে এভাবে বলা যায়, তোমরা কি বলতে চাও যে, কুরআন মাজীদ অল্লাহর কালাম নয়; বরং হযরত মুহাম্মদ (স) স্বয়ং তা রচনা করেছেন? যদি তোমরা মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে উম্মী (স) নিজে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তির দশটি সূরা তৈরি করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক মানুষ ও জ্বিন বা দেব-দেবী সবাই মিলেই তা রচনা করে আনো। কিন্তু তারা দশটি সূরাও তৈরি করতে পারছে না। তাই আপনি বলুন যে, এ কুরআন যদি কোনো মানুষের রচিত কালাম হতো, তাহলে এ কালামের অনুরূপ কালাম জগতের পণ্ডিতরা রচনা করতে সক্ষম হতো। সকলের অপারগ হওয়া এর প্রকৃত প্রমাণ যে, কুরআন একমাত্র আল্লাহর বাণী। আর এটা মহান স্রষ্টার নিকট হতে এসেছে, যা রচনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ কথার মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস-বৃদ্ধি করারও কোনো অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরি করার জন্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হলো, তখন তাদের অক্ষমতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্যে কুরআন কারীমের একটি সূরা বা কিয়দংশ তৈরি করার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা পবিত্র

কুরআনকে যদি মানুষের তৈরি কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশি নয় অনুরূপ একটি সূরা বা সূরার ছোট অংশ রচনা করে আনো। কিন্তু তাদের জন্যে এতটা সহজ করে দেওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাকের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে তারা সক্ষম হলো না। অতএব কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম ও স্থায়ী মুজিযা হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। এজন্যে মহান আল্লাহ বলেন, এখনো কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে না, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে-
“বলে দাও, মানুষ ও জিন সবাই মিলে যদি কুরআনের মতো কোনো জিনিস আনার চেষ্টা করে, তাহলে তারা আনতে পারবে না। তারা পরস্পরে সাহায্যকারী হয়ে গেলেও না।”
(আল কুরআন থেকে সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ৮৮)

কুরআন মাজীদের তিন জায়গায় যেমন- সূরা বাকারার ৪ নং রুকু, সূরা ইখলাস, সূরা কাউছার ও সূরা হজের ২ রুকুতে এ বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। এসব জায়গায় কাফেরদের অপবাদ হচ্ছে, মুহাম্মদ (স) নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। অতঃপর এটাকে আল্লাহর কালাম বলে পেশ করেছেন।

এছাড়াও সূরা ইউনুসে এ অপবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে-
“ হে মুহাম্মদ (স)। বলে দিন, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ, আমি তোমাদের মাঝে ইতঃপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তার পরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না?”
(সূরা ইউনুস: আয়াত ১৬)

এ আয়াতগুলোতে **কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম হওয়ার পক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করা হয়েছে, তা আসলে তিন ধরনের।**
প্রথমতঃ
এ কুরআন স্থায়ী ভাষা, বর্ণনা পদ্ধতি, বিষয়বস্তুর আলোচনা, শিক্ষা এবং গায়েবের খবর পরিবেশনের দিক দিয়ে একটি মুজিযা। এর নজির উপস্থাপন করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের তো দূরে থাক, কোনো পণ্ডিতেরও নেই।

তোমরা বলছ, মানুষ এটা রচনা করেছে। কিন্তু আমি বলছি, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলেও এ ধরনের একটি কিতাব রচনা করতে পারবে না; বরং মুশরিকরা যে জিনদেরকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে এবং কিতাব যাদের উপাস্য হওয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আঘাত হানছে, তারাও যদি কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করার জন্যে একত্র হয়ে যায়, তাহলে তারাও এদেরকে এ কুরআনের সমমানের একটি কিতাব রচনা করে দিয়ে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করতে পারে।

দ্বিতীয়ত:

মুহাম্মদ (স) হঠাৎ করে তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হননি; বরং এ কুরআন নাজিলের পূর্বে চল্লিশ বছর তিনি তোমাদের মাঝেই বসবাস করেছেন। নবুওয়তের দাবি কি কখনো তোমরা তাঁর মুখে ইতঃপূর্বে শুনেছ?

কি ইতঃপূর্বে তোমরা শুনেছ? যদি না শুনে থাক এবং নিশ্চিতভাবেই শুননি, তাহলে কোনো ব্যক্তির ভাষা, চিন্তাধারা, কথা এবং বর্ণনাভঙ্গিতে হঠাৎ এ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে কি?

তৃতীয়ত:

মুহাম্মদ (স) তোমাদের কুরআন শুনিয়ে দিয়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যান না; বরং তোমাদের মাঝেই থাকেন। তোমরা তাঁর মুখে কুরআন শুনে থাক এবং অন্যান্য আলোচনা ও বক্তব্যও শুনে থাক। কুরআনের কালাম এবং মুহাম্মদ (স)-এর নিজের কালামের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির মাঝে পার্থক্য এত বেশি যে, কোনো এক ব্যক্তি এ ধরনের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্টাইল কোনোক্রমে ধারণ করতে পারে না। এ পার্থক্য শুধুমাত্র নবী (স) যখন নিজের দেশের লোকদের মাঝে বাস করতেন তখনই ছিল না; বরং আজও হাদীসের কিতাবগুলোতে তাঁর শত শত উক্তি ও ভাষণ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। এগুলোর বর্ণনাভঙ্গির সাথে কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির এত বেশি পার্থক্য লক্ষণীয় যে, ভাষা ও সাহিত্যের কোনো উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক এ দুটিকে এক ব্যক্তির কালাম বলে দাবি করতে পারবে না।

তবে হ্যাঁ, যদি তিনি শিক্ষিত হতেন তবে বলা যেত যে, তিনি বসে বসে একটা কুরআনের নামে আর একটা হাদীসের নামে আলাদা করে সাজিয়েছেন। কিন্তু তিনি তো কোনো ধরনের অক্ষরজ্ঞান বা লেখাপড়া জানতেন না। তাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এটা তাঁর বাণী নয়। আর এটা মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। এ বিষয়টি এখানে সম্ভবত এ কারণে যে, তোমরা আমার রাসূলকে নবুওয়ত ও রিসালাত পরীক্ষা করার জন্যে রুহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন

প্রকার প্রশ্ন করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কুরআন দেখে নিলেই তাঁর নবুওয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম নয়। তারপরও কি এটা যে আল্লাহর কালাম, তাতে সন্দেহ থাকে? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

অর্থাৎ, তারা কি কুরআন সম্পর্কে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু বর্ণনাগত অসংগতি খুঁজে পেত।
(সূরা নিসা: আয়াত ৮২)

আসলে তারা কুরআন সম্পর্কে মোটেই চিন্তাভাবনা করে না। কেননা, এ গ্রন্থ নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো বাণী হতেই পারে না। কোনো মানুষের ক্ষমতা নেই বছরের পর বছর ধরে এমনকি সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতে থাকবে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত ভাষণ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে; বর্ণের, ছন্দের ও শব্দের মিল যেন মোতির মালায় পরিণত হবে। এর কোনো অংশ অপর কোনো অংশের সাথে সংঘর্ষশীল হবে না। এর মধ্যে মত পরিবর্তনের কোথাও কোনো নিশানাও পাওয়া যাবে না। ভাষণদাতার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার কোনো প্রতিফলনও সেখানে দেখা যাবে না। এ ভাষণের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে পূর্ণ বিবেচনা করার কোনো প্রশ্নই কখনো উপস্থাপিত হবে না। এ ধরনের ভাষণ দেওয়া কোনো মানুষের জন্যে কোনো কালে কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

এছাড়া ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও কুরআন নজিরবিহীন। কিন্তু আল্লাহর চ্যালেঞ্জ মূলত ভাষাশৈলীর ব্যাপারে নয়, যে জিনিসটির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কোনো মানবিক মেধা ও প্রতিভা এমন কিতাব রচনা করতে পারবে না; বরং তা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু, শিক্ষা ও মর্মবাণীর ব্যাপারে।
সুতরাং এ চ্যালেঞ্জ ব্যর্থ হওয়ার মানে হলো, ইসলাম একমাত্র সত্যধর্ম। কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে তা বহাল থাকবে স্বমহিমায়।

৪. বৈসাদৃশ্যহীন কুরআন :

ইসলাম এজন্যে সত্যধর্ম যে, পবিত্র কুরআন

যদি বিভিন্নজনের পক্ষ থেকে নাজিল হতো, তাহলে এ কুরআনের এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের হাজারো বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যেত। অথচ পবিত্র কুরআন গভীরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৩০ পারা কুরআনে কোনো প্রকার বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় না। মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

অর্থাৎ, তারা কি কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসংগতি পেত।

(. সূরা নিসা: আয়াত ৮২)

আপাতদৃষ্টিতে যদি আমরা ধরে নিই যে, এ কুরআন মুহাম্মদ (স) নিজে রচনা করেছেন, একটার সাথে আরেকটার মিল করেছেন অনেক সাজিয়ে-গুছিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা এ রকম নয় যে, তিনি লেখাপড়া করে বসে বসে অনেক চিন্তা করে অনেক কাটাছেঁড়া করে কুরআন সাজিয়েছেন। হয়তো বা তা সম্ভব হতো যদি তিনি লেখাপড়া জানতেন। কিন্তু যার ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি তো অক্ষরজ্ঞানহীন। কোনো প্রকার লেখাপড়া জানেন না। তা ছাড়া যখন যা নাজিল হয়েছে তিনি সাথে সাথে বিভিন্ন সাহাবীদের লিখে রাখতে বলেছেন। সুতরাং কোনো অবস্থায় বলা যায় না যে, তিনি নিজে তৈরি করেছেন বা নিজের মুখের বাণী নিজে বসে বসে হাতে-কলমে সাজিয়েছেন।

কুরআনের ভাবধারার প্রতি যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব, তখনকার আরো বড় বড় ভাষাপণ্ডিতেরা এর ভাষা ও ভাবধারা দেখে চমকে ওঠেছিলেন। আর তাদের অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, না না এটা মুহাম্মদের বানানো কোনো কথা নয়; বরং এটা ঐশীমণ্ডিত এক চমৎকার বাণী, যার কোনো জুড়ি নেই। যেহেতু মহান প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে সেহেতু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এতে সামান্যতম কোনো বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই বোঝা যায়, এটা মহান আল্লাহর বাণী, যা কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ চ্যালেঞ্জ হাজার

বছর আগ থেকে ঘোষিত। তাহলে যুক্তির কষ্টিপাথরে এটা সত্যধর্ম না হলে আর কোনটা সত্যধর্ম হবে একটু বিবেক খাটিয়ে বলুন তো? দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে কি এ রকম চ্যালেঞ্জ আছে?

৫. কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণঃ

পবিত্র কুরআনের বাণী পড়ে, হাদীসের মর্ম অনুধাবন করে অনেক অমুসলিম প্রতি বছর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে কোনো মানুষ কি হিন্দু বা

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করছে? মোটেই না। তাহলে এটা কীসের আলামত? অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আজ কুরআন বুঝে ঈমান আনছে। বিশেষ করে আজ পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেছে। আপনার কী মনে হয় এটা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ ছাড়া অন্য কিছু? আপনি হয়তো বলবেন, খ্রিষ্টধর্মও তো লোকেরা গ্রহণ করছে। আসলে বাইবেল পড়ে কেউ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করছে না। অজপাড়া-গাঁয়ে যেখানে সভ্যতা
সংস্কৃতি এখনো পৌছেনি; যেমন- আমাদের দেশের জেলে পাড়া ও উপজাতি এলাকায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে থাকে। সেখানে গিয়ে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারীরা কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করছে। মানুষের সেই ধর্মান্তরও দেখা যায় সাময়িক। সুযোগ-সুবিধা শেষ হলে তারা আবার স্বধর্মে ফিরে যায়।
বলুন তো, ইসলামের বেলায় কি সেরূপ ঘটছে? ইসলাম কি কাউকে টাকা-পয়সা দিয়ে কোনো সময় ধর্মান্তরিত করেছে বা করছে? না, তা মোটেই নয়। ইসলামের প্রতি কেউ এ অপবাদ দিতে পারবে না।
ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণের হার আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা যদি নিজ আদর্শের ওপর অটল থাকতে পারত, তাহলে ইসলামের যে কত দ্রুত প্রসার ঘটত, তা বলা বাহুল্য। আপনারা দেখবেন, বিশ্বের কোথাও আজ মুসলমানদের দেখে কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে না; বরং মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্র দেখে অমুসলিমদের মাঝে এর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে। ইসলামের যথার্থতা উপলব্ধি করেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। তাই বোঝা যায়, ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম। প্রকৃতপক্ষে আর কোনো সত্যধর্ম এ পৃথিবীতে নাই।

[ইসলাম কেন সত্য ধর্ম?-এই টপিকের
তথ্যসূত্র:
“বই :ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠধর্ম
লেখক : অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া”]

ইসলাম কাদের? :

কোনো অমুসলিম ভাইকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বলুনতো, ইসলাম কাদের জন্য? এর উত্তরে তারা বলবে, ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম।
একই প্রশ্ন যদি কোনো মুসলমানকে করা হয়, তাহলে তার উত্তরে মুসলমানরা বলবে ইসলাম আমাদের ধর্ম।

বন্ধুগণ! উত্তরটি কি সঠিক হয়েছে? না, সঠিক হয়নি। সঠিক উত্তর হলো, ইসলাম সকল মানুষের। ইসলাম হলো, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম। ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত। আল্লাহর নেয়ামত হিন্দু মুসলিম সবার জন্য সমান হয়। পৃথিবীর আটশ কোটি মানুষের মধ্যে, মাত্র দুইশ কোটি মানুষ মুসলিম। এটা কীভাবে সম্ভব আল্লাহ তা'আলা মাত্র ২০ ভাগ মুসলমানকে ইসলামের মতো নেয়ামত দেবেন, আর বাকিদেরকে দেবেন না? না, এটা হতে পারে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ধর্ম সকল মানুষের জন্য। কারণ আল্লাহর নেয়ামত সবার জন্য সমান হয়। যেমন পানি, চাঁদ, সূর্য, শষ্য, ধান, গম ইত্যাদি। আল্লাহর এসব নেয়ামতের মধ্যে কোনো ধরনের ভাগ হয় না। এমনটিও হয় না যে, এটা মুসলমানদের জন্য আর ওটা অমুসলিমদের জন্য। ঠিক ইসলাম যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাই ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য হতে পারে না। ইসলামকে মানা হিন্দু, খ্রিস্টানসহ সকল অমুসলিম ও মুসলিমদের জন্য সমান।

চলুন দেখি কুরআন এ ব্যাপারে কী বলে?
কুরআনে হাকীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এরশাদ করেন-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।।
(সুরা আলে-ইমরান: ৩:১৯)

কোনো অমুসলিম যদি পরকালের সফলতার জন্য, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে অনুসরণ করে, তাহলে সে কি সফল হবে? মুক্তি পাবে? না কখনও না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

“যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম কামনা করবে, তার থেকে তা কখনই কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।”
(সুরা আলে-ইমরান: ০৩:৮৫)

আল্লাহ তা'আলা তার নেয়ামতকে সকল মানুষের জন্য ব্যাপক করেছেন।
বাতাস সকল মানুষের জন্য। পানি সকল মানুষের জন্য। চন্দ্র, সূর্য সবকিছু সকল মানুষের জন্য। আর ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য হবে, এটা হতে পারে না। সকল মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম।

এখন প্রশ্ন হলো, এই কথা কি অমুসলিমরা জানে যে, ইসলাম তাদেরও ধর্ম? জানে না। মুসলমানরা জানে। কারণ তারা কুরআন পড়ে। অমুসলিমরা তো আর কুরআন পড়ে না। আমরা মুসলমানরা কি অমুসলিমদেরকে বলেছি যে, ভাই! আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, কারণ ইসলাম আপনারই ধর্ম। আপনার মালিকের পক্ষ থেকে আসা ধর্ম যদি আপনি না মানেন, তাহলে আপনাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলতে হবে। আমরা কি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি?

বন্ধুগণ! অমুসলিমদেরকে কারা দাওয়াত দিবে? এখন কি কোনো নবী আসবে তাদেরকে দাওয়াত দিতে? না কোনো ফেরেশতা আসবে? কেউ আসবেন না, এই দায়িত্ব আমাদেরই, আমাদেরকেই দাওয়াত দিতে হবে। সকল মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব হলো আমাদের মুসলামানদের। আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে দাওয়াতের হক আদায় করার তৌফিক দান করেন। আমিন!!

কোনো অমুসলিম ভাইকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বলুন তো আপনার স্রষ্টা বা মালিক কে? কেউ বলবে ইশ্বর, কেউ বলবে ভগবান, কেউ বলবে মালিকে। মুসলমানরা বলবে আমাদের মালিকের না হলো আল্লাহ। এই উত্তর কি সঠিক? আল্লাহ কি শুধু মুসলমানদের স্রষ্টা? না, তিনি হলেন সকল মানুষের শ্রষ্টা ও মালিক। তারই ইবাদত করতে হবে। দেখুন এ ব্যাপরে আল্লাহ তাআলা কী বলেন-

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর ইবাদতের হুকুম দিতে গিয়ে এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* ۝

অর্থ: হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারি অর্জন করতে পারবে।
(সুরা বাকারাহ,আয়াত-২১)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা)يا ايها الناس(শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হয়, হে মানুষগণ! এখানে "الناس" শব্দের ভেতর রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে, কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে, সকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত। এখানে না আছে কোনো যুগের শর্ত, না আছে কোনো অঞ্চল নির্দিষ্ট। বরং সকল মানুষকে আল্লাহ

তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সকল অমুসলিম তারাও মানুষ। পৃথিবীর আটশ কোটি মানুষ সকলেই মানুষের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো আটশ কোটি মানুষ সকলেই কি আল্লাহকে মাননে? আল্লাহর ইবাদত করে? অথবা কমপক্ষে এতটুকু কি জানা আছে যে, আমাদেরকে এক আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে? যদি উত্তর হয় 'না'। তাহলে কোনো মুসলমানের পক্ষ থেকে অমুসলিম ভাইদের কাছে এ কথা পৌঁছানো হয়েছে? তবে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব কার? অবশ্যই মুসলমানদের। আমরা কি তাদের কাছে এই দাওয়াত পৌছিয়েছি? কখনও
কি অমুসলিম ভাইকে বলেছি? ভাই! আপনার মালিক হলেন আল্লাহ, তাকেই মানতে হবে। মুসলমানের উচিত, তারা সকল মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম ও দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

মুহাম্মাদ সা. কাদের নবী?
কোনো অমুসলিমকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বলুন তো! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদের নবী? তারা বলবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নবী। এমনিভাবে মুসলমানদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বলুন তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদের নবী? তখন তারা বলবে তিনি তো আমাদেরই নবী। এই উত্তরগুলো কি সঠিক? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি শুধু মুসলমানদেরই নবী?

চলুন আমরা কুরআনে হাকীমকে জিজ্ঞাসা করি, কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে? কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
অর্থ: বলে দাও, হে মানব মণ্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, সমগ্র আসমান ও জমিনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর ওপর, তাঁর প্রেরিত নবীর ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের ওপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।'
(সুরা আ'রাফ: আয়াত: ১৫৮)

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে । 'মানুষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন।
অর্থাৎ হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ইয়াহুদী ইত্যাদি, সকলেরই নবী হলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ তারা সকলেই মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা কি জানে

বা মনে করে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম তাদেরও নবী? না কখণও না। তারা জানে না। জানবে কিভাবে? তারা তো কুরআন পড়ে না। মুসলমানরা কুরআন পড়ে। কিন্তু আমরা কোনোদিন কোনো অমুসলিমদেরকে বলি নিযে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম তাদেরও নবী। এর জন্য অপরাধী হলাম আমরাই।

উপরোক্ত আয়াতে লক্ষ করলে আরো একটি বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। এখানে جميعً শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হলো 'সবাই'এখানে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে, কোন শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি। অতএব, আমাদের জন্য উচিত, আমরা নিজেরা ভুল ধারণা পোষণ করবো না এবং অন্য মানুষের ভুলটি ভাঙিয়ে দিবো। চলুন আমরা সকল মানুষের কাছে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দিই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন।

কুরআন কাদের?

কুরআন সম্পর্কে আমাদের মাঝে একটি বড় ভুল ধারণা রয়েছে। কোনো হিন্দু ভাইকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বলুনতো কুরআন কাদের গ্রন্থ? উত্তরে তারা বলবে এটা মুসলমানদের গ্রন্থ। আমাদের গ্রন্থ হলো গীতা, রামায়ন, ইত্যাদি। খ্রিস্টান ভাইয়েরা এমন প্রশ্নের উত্তরে বলবে আমাদের কিতাব হলো বাইবেল। আর কুরআন হলো মুসলমানদের কিতাব। ঠিক কোনো মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বলুন তো কুরআন কাদের জন্য? তাহলে মুসলমানরাও বলবে, কুরআন আমাদের জন্য। চলুন কুরআনকে জিজ্ঞাসা করি, কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে- আল্লাহ তাআলা বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: রমযান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।

(বাকারাহ: আয়াত: ১৮৫)

উক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, هُدًى لِلنَّاس)সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েত) বলা হয়েছে। তাতে শুধু মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়নি, তা কেবল তোমাদের জন্য পথ প্রদর্শক।

অতএব, আমরা যদি মনে করি যে, আল-কুরআন শুধু মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ, তাহলে তা হবে নিছক ভুল ধারণা।

আবার একই প্রশ্ন উঠবে ৬শ কোটি অমুসলিম তারা কি জানে এই কিতাব তাদের জন্য পথ পদর্শক? এর উত্তরে আপনি নিজেই বলবেন অবশ্যই তারা জানে না।

কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য হলো, সকল মানুষের হেদায়াত। শুধু মুসলমানের হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে তার ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শুধু ২০ ভাগ মানুষ মুসলমান এবাদাত করবে? এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু মাত্র ২০ ভাগ মানুষ তার ওপর ঈমান আনে। ঠিক কুরআন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু এর অনুসারী মাত্র ২০ ভাগ। বাকি ৮০ ভাগ অমুসলিম তাদের এটাও তো জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের প্রতিপালক। তাদেরকে আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। এও জানে না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরও নবী। কুরআন তাদের হেদায়েতের জন্য এসেছে এটাও তাদের জানা নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলা কি ৮০ ভাগ অমুসলিমদের জন্য আরো কোনো ধর্ম পাঠাবেন? তাদের জন্য কি আরো কোনো রাসুল আসবেন?
না, কখনও না। কারণ আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম।
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শেষ রাসুল তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। ওহীর ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর নতুন কোনো কিতাব তো আসার প্রশ্নই আসে না। এখন দেখতে হবে ৮০ ভাগ অমুসলিমদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছানো এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব কাদের? আল্লাহ তা'আলা কি মুসলমানাদেরকে শুধু মুসলমানাদের এসলাহের জন্য পাঠিয়েছেন? না কি অমুসলিমদের পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন? দেখুন এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কী বলেন।

মুসলমান কাদের জন্য?

সাধারণ মুসলমানদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আমারা কাদের জন্য তাহলে অনেকেই বলেন, আমরা আল্লাহর জন্য। এই উত্তরটিও সঠিক তার অবস্থান থেকে। সামষ্টিকভাবে আমরা হলাম সকল মানুষের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল মানুষের জন্য বের করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, ... তোমরা সর্বত্তম জাতি, তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর।

(আলে ইমরান-১১০)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা । 'মানুষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো, অমুসলিমরাও মানুষ। মুসলিম জাতিকে শুধু মুসলমানদের জন্য পাঠাননি বরং সকল অমুসলিমদের জন্যও পাঠিয়েছেন।

বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।)১(خير امة 'উত্তম জাতি' বলে সম্বোধন করেছেন। (২(الناس 'মানুষ'। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর ৬শত কোটি অমুসলিম "মানুষ" এর জন্য। ২শত কোটি মুসলমান خيرامة 'উত্তম জাতি' ৬শত কোটি অমুসলিম মানুষকে المعروف সৎকাজের আদেশ করবে এবং المنكر অসৎ কাজের বাঁধা প্রদান করবে।

এই আয়াতে একটি সুক্ষ্ম বিষয় বুঝা যায়। তা হল উম্মতের দায়িত্বকে ঈমানের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। জিম্মাদারি দুই প্রকার।

(১) ব্যক্তিগত জিম্মাদারি। (২) সমষ্টিগত জিম্মাদারি।
ব্যক্তিগত দায়িত্বে আল্লাহ তা'আলা নিজের হক প্রাধান্য দিয়েছেন।
কিন্তু যেখানে সমষ্টিগত দায়িত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বান্দার হককে প্রধান্য দিয়েছেন।
উপরোক্ত আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। উম্মত যেন জাতীয় দায়িত্বের কথা চিন্তা করতে গিয়ে এ ধোঁকায় না পড়ে যে, এটাতো আমার কাজ নয়। আমার দায়িত্ব নয়। এর দ্বারা জাতিয় দায়িত্বের অনুভব হয়।

মোটকথা, মুসলমানদের কাজ হলো, সকল মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেবে। তাদের সামনে কুরআন ও নবীজীর পরিচয় তুলে ধরবে। আর ইসলামের পরিচয় করিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে।
আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন উম্মতকে তার জিম্মাদারির হক আদায় করার তৌফিক দান করেন। আমিন!

অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব শুধু শরয়ী না, মানবিক দায়িত্বও বটে।

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া মানবতার দাবি

মানব থেকে মানবতা, প্রতিটি মানুষের মানবতার দাবি হলো, সে অন্য মানুষের উপকার করবে। আর কেউ যদি কোনো বিপদে পড়ে তাহলে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। আমরা মুসলমানগণ জানি, প্রতিটি অমুসলিম মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ: আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী ভাবে থাকবে। তারা সৃষ্টির অধম। (সূরা-বাইয়্যিনাহ-আয়াত ৬)

প্রিয় পাঠক! আপনার প্রতিবেশী হিন্দু বা খ্রিস্টানদের বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে আপনি কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবেন? অবশ্যই আগুন নিভাতে যাবেন। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো মুসলিম মহল্লায় আগুন লেগে যায়, তাহলে প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইয়েরা কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবে না? অবশ্যই আগুন নিভাতে আসবে। দেখুন! আমরা দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী আগুন থেকে উদ্ধার করার জন্য কত সুন্দর মানবতার পরিচয় দিয়ে থাকিত। কিন্তু একটু কি চিন্তা করেছি যে, দুনিয়ার আগুনে জ্বলে যদি কারো ত্বক নষ্ট হয়ে যায়, বা ঘর-বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তাহলে ঔষধ দ্বারা পুনরায় তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

মুসলিম মহল্লায় আগুন লেগে যায়, তাহলে প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইয়েরা কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবে না? অবশ্যই আগুন নিভাতে আসবে। দেখুন! আমরা দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী আগুন থেকে উদ্ধার করার জন্য কত সুন্দর মানবতার পরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু একটু কি চিন্তা করেছি যে, দুনিয়ার আগুনে জ্বলে যদি কারো ত্বক নষ্ট হয়ে যায়, বা ঘর-বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তাহলে ঔষধ দ্বারা পুনরায় ত্বক ফিরিয়ে আনা সম্ভব। পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি বানানো সম্ভব। কিন্তু যে ভাইটি ইসলাম গ্রহণ না করে, চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, যার থেকে ফেরানো বা বাঁচানোর কোনো পথ নেই, সেই চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য কি কখনো ভেবেছি?

প্রিয় পাঠক! আমাদের অনেক অমুসলিম বন্ধু আছেন, যাদের সাথে একত্রে চলা-ফেরা করি। একই অফিসে চাকরি করি। তার দোকান থেকে কেনা-কাটা করি। তার বিপদে-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়াই। একথাও জানি এই ভাইটি মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী আগুনে জ্বলবে।

প্রিয় পাঠক! আমাদের কেমন মানবতা? আমার সামনে আমার এক ভাই বা বোন জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, কিন্তু কোনো দিন এই ভাইটিকে বলিনি যে, ভাই! তুমি যে পথে চলছো এটা জাহান্নামের পথ। কোনো দিন তাকে জান্নাতের পথ ইসলাম দেখাইনি। কেমন জানি তাকে আগুনে জ্বলতে দেখেও আমি চুপ হয়ে আছি। এটা আমাদের কেমন মানবতা? আর কতো দিন এভাবে দেখব? বলুন! এভাবে আর কতোদিন বসে বসে তাদেরকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখব? চলুন, আর সময় নেই, আমার কাছে যদি সত্যিকার মানবতা থাকে, তাহলে আমার প্রতিবেশী অমুসলিমকে আগুনে জ্বলতে দেব না। আমাদের দায়িত্ব হলো তাকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেয়া। মানা না মানা তার ব্যাপার। দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার, গ্রহণ করা-না করা তাদের এখতিয়ার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের আমানত 'ইসলাম' তাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে ওদেরকে চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচানোর মাধ্যম বানিয়ে নিন এবং আমাদের ওপর তিনি খুশি হয়ে যান। আমীন।
[তথ্যসূত্র/বই: ইসলাম কাদের (৫-১৩ পাতা)
লেখক: মুফতি যুবায়ের আহমদ হাফি.]

ইসলাম কি?

উপস্থাপনা: সাগরের যে উদারতা, পাহাড়ের যে অটলতা, আকাশের যে বিশালতা, ইসলাম মানবতার জন্য ঠিক তেমনি। ইসলামকে একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায়। যার শিকড় সুগভীর ভূমণ্ডলে, যার শাখাপ্রশাখা অনন্ত গগনতলে সম্প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত। সবুজ পত্রপুঞ্জে যে বৃক্ষ সুশোভিত, তার প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজির মনোমুগ্ধকর সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। এ বৃক্ষের রসাল ফলের রসাস্বাদনে প্রাণ হয় পরিতৃপ্ত। তাই পরিতয়া তাই কবি নজরুলের কণ্ঠে ধ্বণিত হয়েছে

“ইসলাম সে তো পরশ মাণিক
তারে যে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তার সোনা হল যারা
আমরা তাদেরকেই বুঝি।”

ইসলামের পরিচয়: নিম্নে ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় প্রদান করা হলো-
আভিধানিক অর্থ : إسلام শব্দটি বাবে فعّال(-এর মাসদার, যা ميثم বা سلام মাদ্দাহ

১. الاستسلام। তথা আত্মসমর্পণ করা।

২. الإنْيا। তথা আনুগত্য।

৩. ৫ তথা মেনে চলা।

8. ُالْخُصُوع তথা বশ্যতা স্বীকার করা, অবনত হওয়া।

৫. ঠেলে দেয়া।

6. ِتَفْرِيضُ الْأَمْر তথা কোনো কাজ ন্যস্ত করা।

ى ِ الدُّخُولُ فِي السَّلْم 7.؟থা সন্ধিতে উপনীত হওয়া।

*8 ِالدُّخْرُلُ فِي دِيْنِ الْإِسْلَام তথা ইসলাম ধর্ম কবুল করা।

৯. To be secured তথা নিরাপত্তা লাভ করা।
উল্লেখ্য, মূলত إسلام শব্দটি মাদ্দাহ থেকে নির্গত। ইসলাম অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা।

১০. To work sincerely তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

আর যেহেতু বান্দা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে; সেহেতু ইসলামকে । বলা হয়। ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের নিম্নোক্ত উক্তিগুলো পারিভাষিক সংজ্ঞা: ইসলামের পারি প্রণিধানযোগ্য-
১. হাদীসে জিব্রাইলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন -

“ ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্যবানদের হজ্জ করা।”

২. আবুল বারাকাত আন নাসাফী বলেন-

السلامُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ بِاللَّهِ تَعَالَى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ بِأَسْمَانِ صفاتِه وَشَرَائِعه.

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী যৌক্তিক স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও শরীয়তের আদেশসমূহ মেনে চলা।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন-

و التَّسْلِيمُ وَالْانْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللهِ وَرَسُولِ وَالْاجْتِنَابُ عَنْ نَوَاهِيْهِمَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া, সেগুলোর অনুকর করা এবং তাঁদের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করার নামই ইসলাম।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন-

8منَ الْانْقِيَادُ لِلَّهِ تَعَالَى مَعَ قَبُولِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَالتَّلَفُظُ كلمتي الشَّهَادَةِ وَالْإِنْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاسْتِفَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَات.

৫ . আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে-

نُوَإِظْهَارُ الْخُصَوْعِ وَالْقَبُولُ لِمَا أَتَى بِهِ مُحَمَّد. ً

৬. আল কাসুল ফিকহী প্রণেতার মতে-ﷺ مُوَ الْأَنْقِيَادُ لِمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ

৭. লিসানুল আরব প্রণেতার মতে-

الإسلام من الشَّرِيعَةِ إِظْهَارُ الْخُضُوع وإظْهَارُ الشَّرِيعَةِ وَالْتِزَامُ لِمَا أَتى ب النَّبِيُّ وَبِذِلِكَ يُحْفَنُ وَيُتَدَفَعُ الْمَكْرُوه.

৮. দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেন- Islam is not only a religion, but also a complete comprehensive dynamic and scientific code of life. অর্থাৎ, ইসলাম নিছক ভক্তি ও তপস্যামূলক কোনো ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা।

৯. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, হযরত আদম (আ) থেকে শেষ। থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই ইসলাম।

১০. আল্লামা ইকবাল বলেন, সঠিক মানবধর্ম বা সঠিক জীবনব্যবস্থার নামই ইসলাম।

১১. ড. এম হাসান বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসসহ বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত একটি নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম।

১২. কারো মতে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, মনেপ্রাণে তার বশ্যতা স্বীকার করার নাম ইসলাম।

মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল সমস্যার সঠিক এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
[সূত্র: আল ফাতাহ গাইড, ইসলামিক স্টাডিজ ফাযিল (ডিগ্রি) ৩য় বর্ষ]

أَرْكَانُ الإسلام و:

ইসলামের রুকনসমূহ:
যেসব ভিত্তি ও মূলনীতির ওপর ইসলামের বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেগুলোকে আরকানুল ইসলাম বলা হয়। ইসলামের রুকন হলো ৫টি। ১. ঈমান,
২. সালাত,
৩. রোযা,
৪. হজ্জ ও
৫. যাকাত।
নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো-

১. ঈমান : এ বিশ্বজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ওপর অদৃশ্যভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। মূলত ঈমানই হলো মুসলমানদের মূলধন। মুসলিম দাবিদার ব্যক্তির অন্তরে এর মর্যাদা উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। নবী করীম (স)

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

২. সালাত: সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। প্রতিটি মুসলিম প্রত্যহ পাঁচবার সালাত কায়েমের লক্ষ্যে মসজিদে সমবেত হওয়ায় তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। জামায়াতে সালাত আদায় করার মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হ্যা। সালাতের মধ্য দিয়েই ধনীগরিব, রাজাপ্রজা একে অপরের বংশ কৌলীন্যের বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

মানবসমাজে যখন নৈতিক বা আত্মিক অধঃপতন ঘটে তখনই দেখা দেয় সামাজিক দ্বন্দ্বকলহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব। এ সালাত প্রতিটি নারীপুরুষের মাঝে নৈতিক সত্তা জাগ্রত করে তাকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে সহায়তা করে। একতাবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। জামায়াতবদ্ধভাবে সালাত আদায় মুসলমানদের ঐক্যের সূত্রে গেঁথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে দিন কাটানোর নিয়মাবলি শিক্ষা দেয়।

৩. রোযা: স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে রোযা অন্যতম মাধ্যম। ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে রোযার বহু গুরুত্ব রয়েছে। সাওম তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। একজন মুমিন রোযার যাবতীয় নিয়মনীতির দাবি রক্ষাপূর্বক রোযা আদায় করলে সে অবশ্যই তাকওয়াবান হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

সাওম মূলত আত্মিক শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অন্যতম সোপান। রোযার আভিত্মক শিক্ষা প্রকৃত রোযা পালনকারীর সামগ্রিক জীবনে কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ তায়ালার বাণী-وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
রোযা একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন। রোযার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যলাভ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الصُّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِى به

শয়তানের প্রবঞ্চনা, কুপ্রবৃত্তি ও প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য রোযা ঢালস্বরূপ। রোযা রাখলে বান্দ্য শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারে।

৪. হজ্জ : বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ইসলামী মহাসম্মেলন হলো হজ্জ। পবিত্র কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের সুদূর প্রান্তরসমূহ থেকে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ হৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা ও আবেগজড়িত চিত্তে মক্কায় হাজির হয় এবং সম্পাদন করে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি। কার্যাবলি। মূলত হজ্জ মুসলিম জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ঐক্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ইবাদত। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয় বলে এর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম। হজ্জ মুসলিম উম্মাহর মহামিলনের মহোৎসব।

৫. যাকাণ্ড; যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার (Economic system) মূলভিত্তি এবং ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনে যতবার নামাযের কথা বলা হয়েছে, ততবারই যাকাতের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- اقيمُوا الصَّلوةَ وَأتُوا الأكرة :মূলত যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সঞ্জীবনী শক্তি। তাই দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের গুরুত্ব অতীব ব্যাপক।

উপসংহার: উপরিউক্ত পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে। ইসলামের সুরম্য প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে এ পাঁচটি স্তম্ভের ওপর। এছাড়া অন্যান্য বিষয় হলো এর সঙ্গে সম্পর্কিত শাখাপ্রশাখা। এ পাঁচটির যে কোনোটির অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

[সূত্র:
আল ফাতাহ ফাযিল (স্নাতক) পাস
স্টাডি সিরিজ। তৃতীয় বর্ষ।
ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র।
২৫,২৬ পাতা।
গ্রন্থনা: মাওলানা মোঃ মহিবুল্লাহ আজাদ, মাওলানা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম,
মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন।
সম্পাদনা :আল ফাতাহ সম্পাদনা পর্ষদ]

তাওহীদ :

তাওহীদ হলো আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূল ভিত্তি। ইসলামের সকল শিক্ষা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির মূল জাধার হিসেবে বিবেচিত। নিয়ে তাওহীদের পরিচিতি ও প্রারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

توحيد-এর আভিধানিক অর্থ:توحيد শব্দটি إسم مصدر বাবে تفعيل : এটি وحد

মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ- একত্ববাদ, কাউকে একক বলে স্বীকার করা। এটা শিরক-এর বিপরীত। তবে অভিধানবেত্তাগণ توحيد শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১.আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো- جعل الشئ واحا অর্থাৎ কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন-

اَلتَّوْحِيدُ هُوَ الْإِيْمَانُ بِاللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لا شرى অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোনো শরীক নেই, তিনি এক-এ মর্মে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই তাওহীদ।

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-

اَلْحُكْمُ بِأَنَّ الشَّيْء وَاحِدٌ

৪. দর্শনশাস্ত্রে তাওহীদ হলো- اَلْقَوْلُ بِإِلَهِ وَاحِد অর্থাৎ এক উপাসকের কথা বলা।

৫. আহলুস সুন্নাহর মতে-

نَفْيُ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيل

৬.ইংরেজিতে Unique. Singular, Unmatched, Without, Equal, Incomparable ইত্যাদি বলা হয়।

তাওহীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ - اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد.

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের চ্যকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

-যাবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন-نَى الْكَفَّ وَالْمَثَلِ عَنْ ذَاتِ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَنَفْسُ الشَّرِيكِ إِن ربُوبِيْتِ وَعِبَادَتِهِ عَزَّ وَجَل.ّ

অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতা অস্বীকার করা এবং তাঁর প্রভুত্ব ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদারি থেকে বিরত বাকাকে তাওহীদ বলা হয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন-

সর্বাং, আল্লাহর هو توحيد الله وافراده بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفاد একত্ববাদ ও তাঁর একক হওয়া যা তাঁর প্রতিপালনে, ইবাদতে, নাম ও বিশেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা-ই তাওহীদ।

৩. আবদুল আযীয মুহাম্মদ সালমান বলেন

ا والعرافة واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال واعتقاده رة له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعمودية على خلقه اجمعين.

৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর التاجند تis গ্রন্থে বলেন, তাওহীদ হ্যা ইন ইসতিয়ানাত তথা দাসত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষিত করা।

৫. আকাইদশাস্ত্রের পরিভাষায়- هو الاثمان بالله تعالى وحده لا شريك স্থাপন করা, যার কোনো অংশীদার নেই অর্থাৎ, এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন

৬. আহলুল হাকীকতের মতে-

قال الالهية عن كل ما يتصور الأفهام ويتخيل في الأوهام والانعان.

৭. Encyclopadia of Islam-গ্রন্থে বলা হয়েছে- It is applied theolog oneness (Wahdaniyah) of Allah in oll it's meaning

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁর যাবতীয় বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ।

তাওহীদের গুরুত্ব:

মানবজীবনে তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নিয়ে কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো-

১. ঈমানের মূলভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। শুধু আল্লাহকে বিশ্বাসের মাধ্যমে মুমিন হওয়া হওয়া সম্ভব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা। আল্লাহকে স্বীকার করে তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশিদার করার নাম ঈমান হতে পারে না; বরং এটি শিরক।

২. তাওহীদ ইসলামের প্রথম মঞ্জিল :

তাওহীদ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাবের মার্তা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের প্রয়জ ইসলামের প্রথম মঞ্জিল, প্রথম অবস্থান, যেখান থেকে একজন মুমিন অল্লাহর ধাবিত হয়। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত এবং হাত ওয়াসসিফাত-এর ওপর এককভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। কোনো ব্যক্তি যদি নয় আদায় করে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে একক উপাস্য, একক প্রতিপালনকার হিসেবে বিশ্বাস না করে, তাহলে সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। ইসলামের প্রলো হলো 'তাওহীদ' আর দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেয়ারও মূলমন্ত্র হলো তাওহীদ। জো دخل الجنة لا إله إلا الله مَنْ كَانَ أَخِرُ كَلَامِهِ অর্থাৎ, যার শেষ কথা হবে 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই' (তাওহীদ)। জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এ স্বীকারোক্তি একজন মুমিন মুসলিমের জন্য জনে প্রথমে যেমন ওয়াজিব, জীবনের শেষ মুহূর্তেও তেমনি ওয়াজিব।

৩. তাওহীদ নবীরাসূলগণের দাওয়াতের প্রধান বিষয়:

তাওহীদ নবী ও রাসূলনে দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয়। মানবজাতির দিশারি হিসেবে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী ও রাসূল এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই তাওহীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে মানবসমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে সকলেই একটি মাত্র ছোট বাক্য।

“ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ “এ কথায় কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে নবী রাসুল তাদের জীবনভর এবং নবীকুলশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর নবী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশটি বছর তাওহীদের শিক্ষা প্রচারের পজন্য সংগ্রাম করেছেন। মক্কার জীবনে নবুয়তের তেরো বছরশুধু তাওহীদ সংক্রান্ত বাণীই প্রচার করেছেন এবং তাওহীদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি বহু বাধা বিঘ্ন ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। তথাপি এ কাজ থেকে বিরত থাকেননি।

৪. তাওহীদ নবী রাসুলগণের প্রথম দায়িত্ব:

তাওহীদের বাণী প্রচার করা নবীরসরাজে প্রথম দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ পাই। যেমন হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। এ ব্যতীত কোমাদের কোনো উপাসা নেই।"

হয়রত হুদ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- فقال يقوم أعبدوا الله كا لكم من اله مين অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই।

হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- يقوّم اميدوا الله ما لكم كن না অথাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

وَلقد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت . অর্থাৎ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ আদেশ দান করে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাক।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون

অর্থাৎ আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন-

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه অর্থাৎ, আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত

মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল। সুতরাং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানবান নারীপুরুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের

সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজিব।

৫.আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের পূর্বশর্ত তাওহীদ: সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট তা হলো, তায়ালার একত্ববাদ বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। আর এ বিষয়েও একমত যে, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়ই এ একত্ববাদ বা তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে। একজন মানুষের জন্য সালাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে তাওহীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। সালাত আদায় করার পূর্বেই তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে।

৬.ইসলামের মৌলিক কর্মকাণ্ড তাওহীদ: ইসলামের সকল বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে হচে এ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। শরীয়তের সকল প্রকার কর্মকাণ্ড এ তাওহীদেরই শাখাপ্রশাখা মাত্র।
৭.ইসলামী বিধিবিধানের উৎস তাওহীদ: ইসলামের নৈতিক বিধিবিধান ও সামাজিক আইনকানুন এ তাওহীদ থেকে উৎসারিত। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সত্তা। ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবীরাসূল, = কেয়ামত, আখেরাত, ফরয, ওয়াজিব এক কথায় প্রতিটি জিনিসের ভিত্তিই আল্লাহর একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ একটি মাত্র জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে ফেরেশতা, কেয়ামত ও আখেরাতে বিশ্বাস একেবারে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। নবী, -চল এবং তাঁদের আনীত কিতাবাদি আনুগত্য লাভের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফরয, আজব, আনুগত্য ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। আদেশ নিষেধ ও বিধিবিধানে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। এসাটকথা, তাওহীদ এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যা থেকে অপসৃত হলেই গোটা ইসলামী প্রবস্থাপনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এমনকি ইসলাম বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকেনা। তাই তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলা হয়। আর তাওহীদের শিক্ষাকে আল ফিকহুল আকবার বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ বলা হয়।

[তাওহীদ এর তথ্যসূত্র :
আল ফাতাহ ফাযিল (স্নাতক) পাস
স্টাডি সিরিজ। তৃতীয় বর্ষ।
৩৯৯-৪০১ পাতা
ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র।]

সর্বশেষ নবী স:

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বহুবিধ দলীল রয়েছে। যেমন-
ক. কুরআন দ্বারা দলীল: কুরআন মাজীদে খতমে নবুয়তের পক্ষে বহুবিধ দলীল পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন- نَا كَانَ مُحَمَّدًابًا أَحَدٍ مِّنْ رَّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا . মুহাম্মদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে তাঁর দীনকে। পরিপূর্ণ করার ঘোষণা দিয়ে বলেন-
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ بَيْنا . অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে। পছন্দ করলাম।

৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের প্রতিবাদ করে বলেন- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أَوْحَى **إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ لمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهَ** . “ আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে। যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আজ যে দাবি করে, আমিও অবতীর্ণ করে দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। “

খ. হাদীস দ্বারা দলীল:
মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খাতমুন নবুয়ত তথ্য নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো- وَخُيْمُ بِي الثب অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে।
২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلْفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُون .

অর্থাৎ বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী ওফাতলাভ করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন।

৩. রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন- "মুসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ। ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোনো নবী নেই।"

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন- إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ ٱنْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِي وَلَا نَبِي . অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং আমার পর কোনো রাসূল এবং নবী নেই।

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) বলেন- مثلي ومثل الأنبياء كَمَثَلِ رَجُل بَنى نارًا فَأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فَجَعَل النَّاسُ يَدخُلُونَها وَيَتَعَجَّبُون منها ويقولون لولا موضع السنة قَالَ رَسُولُ الله فأنا موضع اللبنة جند تختمت الأنبياء وفى رواية فانا اللَّبِنَةُ وَأَنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّين.

অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ এমন একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতাদান করেছেন, কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল আর অবাক হতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলরার (স) বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের স্থান। কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন-

إِنَّ لِي أَسْمَاءُ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسِ عَلَى قَدَمَى وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ (نَبِي) . অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ ও আমি আহমদ এবং আমি মাহী তথা উচ্ছেদকারী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি حاثير তথা একত্রিতকারী। আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামতের দিন মানুষ একত্রিত হবে এবং আমি عاقب তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই।

গ. যৌক্তিক দলীল:

বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে যদি কোনো ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মদ (স)-কে শেষ নবী হিসেবে আমরাবিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। যেমন-

১. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পরে অন্য নবী বা রাসূল আগমন করবেন। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী মানুষদেরকে জানাবেন। যেমন সূরা সফফে ঈসা (আ)-এর বক্তব্য-
والنشرا برسول ثانى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَد. পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসে বলা হয়নি যে, তাঁর পরে মানবজাতির মধ্যে কোনে রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন।

২. পূর্ববর্তী নবীরাসলগণের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং তাঁদের শিক্ষা ছিল অপূর্ণাঙ্গ এজন্য তাঁদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (স)-এং শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ। তাঁর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ দীনের পূর্ণতাদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-
البناء اليامَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ..

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এজন্য তাদের প্রতি অহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই নতুন নবীর প্রয়োজন দেখা দিত কিন্তু মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। কাজেই এরপর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِين .
قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا .
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا . এভাবে পবিত্র কুরআন ও সকল হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত সম্পর্কে সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে। তিনিই শেষ নবী, তাঁর পর আর কোনো নবী নেই। এমনকি তাঁর পর যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী।

[তথ্যসূত্র: আল ফাতাহ গাইড,
ফাযিল ডিগ্রি ৩য় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র]

সলাত

ِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ। অর্থাৎ, নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁর প্রিয়পাত্র হয়। কাজেই বোঝা যায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সালাত।
সলাত/নামাজ এর অর্থ নিম্নরূপ-

অভিধানিক অর্থ: ১১০ শব্দটি اسم مصدر এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে صح: স্থান কাল পাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন-
১. আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি।
২. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে প্রার্থনা।
৩. ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- اِسْتِغْفار তথা ক্ষমা প্রার্থনা।
৪. নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- দরূদ পড়া।
৫.পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে- তাসবীহ পড়া।
অভিধানে সালাতের অর্থ চার- রহমত, দরুদ, দোয়া ও ইসতিগফার।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হচ্ছে-هِي
ِعِبَارَةٌ عَنِ الْأَرْكَانِ الْمَعْهُوْدَةِ وَالْأَفْعَالِ الْمَخْصُوصَةِ. অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নামই সালাত। ২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে-

ِفِي الْعِبَادَةُ الْمُخْصُوصَةُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُودُ أَوْقَاتِهَا فِي الشَّرِيعَةِ . অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা
বর্ণিত হয়েছে। ৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন-
هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَرْكَانِ مَخصُوصَةِ وَأَذْكَار مَعْلُومَةِ بِشَرَائِطَ مَخصُوصة যিকির (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়া। অর্থাৎ, সালাত একটি ইবাদত, যার জন্য কিছু রোকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত কিছু
শর্তের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়।

মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম সালাত। যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর আর শেষে রয়েছে তাসলীম। সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أقِيمُوا الصَّلوةَ وَأتُوا الزكوة.

সালাতের শর্তাবলি:

সালাতের শর্তাবলি নিম্নরূপ-

১. নিয়ত করা : সালাত আদায়কারীকে পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট সালাতের কথা মনে মনে স্থির করতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

২. শরীর পাক: অযু কিংবা গোসলের প্রয়োজন হলে তা সমাধা করে শরীর পবিত্র করা।

৩. কাপড় পাক: যে কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে, তা পবিত্র হওয়া।

৪. সালাতের জায়গা পাক: যে স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া।

৫. সতর ঢাকা: পরিমাণ হলো, পুরুষদের জন্য নাভী থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত সতর আর মহিলাদের জন্য হাত, পা, মুখ ব্যতীত সমস্ত শরীর।

৬. কিবলামুখী হওয়া: কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْر

৭. নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা: শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করা।

সালাতের রোকনসমূহ:

সালাতের রোকনসমূহ নিম্নরূপ-

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা।
২. কিয়াম করা; সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে।
তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওজরে বসে কিংবা শুয়ে সালাত আদায় করতে পারবে।
৩. কেরাত পড়া: ফরয সালাতের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য সালাতের সকল রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের যে কোনো সূরা অথবা বড় এক আয়াত কিংবা ছোট তিন

আয়াত পাঠ করা।
৪.সেজদায় যাওয়ার পূর্বে সামনে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে রুকু করতে হয়।

৫. সেজদা করা : নাক ও কপাল দ্বারা যমীনের উপর সেজদা করা। যেমন আল্লাহ বলেন-

৬. তাশাহহুদ পাঠ : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা।

ব্যক্তিজীবনে সালাতের প্রভাব:

সালাত নিছক ইবাদত নয়; এর অনেক পার্থিব উপকার এবং প্রভাব ব্যক্তিজীবনে প্রতিভাত হয়। যা নামাযি ব্যক্তির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উপহার বটে। নিম্নে ব্যক্তিজীবনে সালাতের প্রভাব বর্ণনা করা হলো।
১. সালাত তার আদায়কারীকে অশীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।
২. সালাত ব্যক্তির চরিত্রকে সংশোধন করে।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ِإِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر
৩. সালাত আল্লাহর পথে ধৈর্য শিক্ষা দেয়।
৪. অন্তরকে বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে শরীর ও পোশাককে পূতপবিত্র রাখে।
৫. সালাত রবের সাথে বান্দার যোগসূত্র স্থাপন করে।
৬. ব্যক্তিকে স্বীয় দায়িত্ব পালনে উৎসাহ দেয়।
৭.ব্যাক্তিকে প্রত্যুষে জাগ্রত হতে অভ্যস্ত করে, যা তার সুস্থতার সাথে জীবনযাপনে সহায়ক.
৮. শারীরিক ব্যায়াম।এর দ্বারা প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করে এবং গ্রন্থিগুলো শক্ত ও সুকঠিন হয়।
৯. শরীরকে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে।
১০. সর্বদা ময়লা থেকে শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখে ও মনে ফূর্তি যোগায়।

সমাজজীবনে সালাতের প্রভাব: সালাতের সামাজিক প্রকার নিম্নরূপ-

১. সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে: মুসলিম সমাজের মানুষ প্রত্যহ পাঁচবার সালাত কায়েমের লক্ষ্যে মসজিদে সমবেত হওয়ায় তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

২. সালাত আদায় করার মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। সালাতের মধ্য দিয়েই ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা একে অপরের বংশ বংশ কৌলীন্যের মর্যাদা ভুলে গিয়ে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

৩. আনুগত্যের প্রশিক্ষণ : সালাতের জন্য একজন ইমাম নির্দিষ্ট থাকেন, যার অনুকরণের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে আনুগত্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়। ইমামের সঠিক নেতৃত্বে মুসল্লিরা পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রশিক্ষণ লাভ করে।

৪. নিয়মশৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ। মুসলমানগণ সালাত আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যহ পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে মসজিদে একত্রিত হয় এবং কাতারবন্দি হয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সাথে সালাত আদায় করে। এতে মানুষ নিয়মশৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ পায়।

৫. নৈতিক উন্নতি: মানবসমাজে যখন নৈতিক বা আত্মিক অধঃপতন ঘটে তখনই দেখা দেয় সামাজিক দ্বন্দ্বকলহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব। এ সালাত মানুষের মাঝে নৈতিক সত্তা জাগ্রত করে তাকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে সহায়তা করে।

৬. আধ্যাত্মিক উন্নতি: একতাবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।

৭. সংঘবদ্ধ জীবনবোধ জাগ্রত: জামায়াতবদ্ধভাবে সালাত আদায় মুসলমানদের ঐক্যের সূত্রে গেঁথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে দিন কাটানোর নিয়মাবলি শিক্ষা দেয়।

৮. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ: সালাতের জন্য মুসল্লিকে পরিধেয় বস্ত্র, সালাতের স্থান ও শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখতে হয়। একজন লোক পূর্ণ নামাযী হলে তার সকল বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা এসে যায়। এতে ব্যক্তির মনের সুস্থ বিকাশ ঘটে ও অসুস্থতা দূরীভূত হয়।

৯ . অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে: যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সালাত আদায় করে সে অন্যায়, জুলুম ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকে। কেননা সালাতের মাঝে মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

১০. সাম্যের বিকাশ: সাম্য বলতে Equality of opportunities-কে বোঝায়। এটা হলো- No man shall be placed in society that constitutes denial of the letter citizenship. বাস্তবে এ সাম্য খোলাফায়ে রাশেদা বিশেষ করে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর পিছনে সবচেয়ে প্রভাবক শক্তি ছিল সালাত। সালাত হলো সাম্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ফকির, বাদশাহ, রাজাপ্রজা, ছোটবড়, ধনীদরিদ্র সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে। সুতরাং সাম্যের বুনিয়াদ পত্তনে সালাতই সবচেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা।

১১. ভাবের আদানপ্রদান: বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে মানুষ সবসময় পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজখবর নিতে পারে না। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমার সালাত এবং দু'ঈদের সালাতে যখন মুসল্লিগণ সমবেত হয় তখন একে অন্যের খোঁজখবর নিতে পারে এবং তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়।

১২. সামাজিক কর্তব্যবোধ সৃষ্টি: সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন কর্তব্যপরায়ণতার অনন্য শিক্ষালাভ করতে পারে। এর ফলে সে পার্থিব জগতে যাবতীয় কার্যাবলি নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করতে সচেষ্ট হয়।

১৩. মুসলমানদের মহাসম্মেলন: সালাত মুসলমানদের নিত্যদিনের বাধ্যতামূলক এক সমাবেশ। এ সমাবেশে ইমাম সাহেব প্রয়োজনীয় হেদায়াতি ভাষণ দিয়ে থাকেন। তাঁর বক্তব্যে সমকালীন সমস্যাগুলো সমাধানের পন্থা বিধৃত থাকে। বিশেষ করে জুমার খোতবায় এর বাস্তব প্রকাশ ঘটে।

১৪. আদর্শ জাতি গঠন: ব্যক্তি সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হলে তার চরিত্রে সততা সালাত সর্বদা ব্যক্তিকে আদর্শ ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। নাগরিকরা নাগরিক হওয়ার পথে পরিচালিত হয়। যার ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের আদর্শ জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান পায়।

সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব:

সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব নিম্নরূপ-

১. কুরআনের তাগিদ : সালাত ইসলামী জীবনদর্শনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান স্তম্ভ। "তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর।"
এ আয়াত কুরআন মাজীদের ৮২ স্থানে এসেছে। সুতরাং সালাত কায়েম করা মুসলমানদের ওপর অবশ্য কর্তব্য।

২. আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম:
আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভই মুমিনের পরম প্রত্যাশা। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা প্রকাশ পায় এবং সে আল্লাহর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়। মহানবী (স) ইরশাদ করেন- مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ ا অর্থাৎ, জান্নাতের চাবিকাঠি হলো সালাত।

৩. সর্বোত্তম ইবাদত: সালাতই মুসলমানদের সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। কুরআনে ৮২ বার সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে, মানবদেহের
মধ্যে মাথা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ইবাদতের মধ্যে সালাত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. মুসলিম অমুসলিমের পার্থক্যকারী: কোনো ব্যক্তি মুসলিম না অমুসলিম তা পার্থক্য করার প্রধান মানদণ্ড হলো সালাত। মহানবী (স) ইরশাদ করেন-
الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرِ تَرْكُ الصلوة .

৫. আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রদর্শন: রুকু, সেজদা, কিয়াম, তাকবীর ইত্যাদির সমন্বিত রূপই সালাত। এগুলোর মাধ্যমে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য ও দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়।

৬. অন্যায় অশ্লীলতা প্রতিরোধকারী: দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে সালাত কায়েমের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে। ফলে আল্লাহর ভয়ে সে যাবতীয় অন্যায় অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

৭. দীন প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি: সালাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সালাত হলো দীনের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি সালাত প্রতিষ্ঠা করে সে দীন

প্রতিষ্ঠা করে, আর যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে দীনকে ধ্বংস করে। তাই বলা যায়, সালাতই হলো ইসলামের প্রধানতম ভিত্তি।

৮. আল্লাহকে স্মরণের উত্তম মাধ্যম: সালাতে রুকু, সেজদা, কিয়ামসহ প্রত্যেক পর্যায়ে। আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। তাই সালাত বান্দার জন্য আল্লাহকে স্মরণের উত্তম মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন- أقم الصلوة لذكرى

৯. আত্মার উন্নতি সাধন: আল্লাহর নৈকট্যলাভ করার প্রধান শর্ত হলো, আত্মিক পরিশুদি আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তি অর্জিত হয়। সালাতের প্রভাবে পাপ পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে বান্দার আত্মার উন্নতি সাধন হয়।

১০. আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির মাধ্যম: আল্লাহর সাহায্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَاسْتَعِيفُرًا بالصبر والصلوة

১১. সফলতার চাবিকাঠি: পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং সফলতা সালাতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী-قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلوتِهِمْ خَشِيعُون.

১২. ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ: সালাত হলো ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। তাই মহানবী (স) ইরশাদ করেন- مَنْ تَرَكَ الصَّلُوةَ مُتَعَمِّدًا فقد كفر

১০. জান্নাতলাভের মাধ্যম: সালাত জান্নাতলাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কেননা মহানবী (স) ইরশাদ করেন- الصلوة مِفْتَاحُ الْجَنَّة

১৪. গুনাহ মার্জনার মাধ্যম: সালাত মানুষের যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করে। যেমন রাসূল (স) বলেন, মুসল্লির অযুর সময় তার কৃত সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ব্যক্তির সকল গুনাহ মাফ করে দেয়।

১৫. ঈমানকে দৃঢ় করে: সালাভের মাধ্যমে একজন মুমিন তার ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভকরে। আল্লাহর কাছে নামাযী ব্যক্তিই প্রকৃত ঈমানদার। নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি পরিচয় আছে এবং ঈমানের বিশেষ পরিচয় হলো সালাত।

উপসংহার: জীবনের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কাঙ্ক্ষিত সুন্দর পার্থিব জীবন এবং পরকালীন মুক্তি বিধানে সালাতের অপরিহার্যতা চিরন্তন।

[সলাত এর তথ্যসূত্র: আল ফাতাহ ফাযিল (স্নাতক) পাস স্টাডি সিরিজ: তৃতীয় বর্ষ । ১৪২,১৪৩ পাতা]

সাওম

উপস্থাপনা: ইসলামী জীবনদর্শনের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সাওম বা রোযা। আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে রোযা একটি অপরিহার্য ইবাদত। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন এবং তাকওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত রোযার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। Oh believers! fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you so that you may guard against evil.
আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা-كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن.
: مَعْنَى الصَّوْمِ لقا .
عزم-এর আভিধানিক অর্থ : صَوْمٌ বা صيّامٌ উভয়টিই বাবে نصر-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো-
১. الهَ الْإِحْسَاكُ عَنِ الْفِعْل
কাজ থেকে বিরত থাকা।
২. কঠোর সাধনা করা।
৩. অবিরাম প্রচেষ্টা।
৪. আত্মসংযম।

সাওম-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- " সাওম হলো সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হতে বিরত থাকা।"

: أَقْسَامُ الصَّوْم)
صَوْم-এর প্রকারভেদ :

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস অনুযায়ী দেখা যায় সাওম তথা রোজা
সর্বমোট ৬ প্রকার।
যথা-
১. ফরয রোযা। যেমন- রমযান মাসের রোযা।
২. ওয়াজিব রোযা। যেমন- মানতের রোযা।
৩. সুন্নাত রোযা। যেমন- জুমার দিন রোযা রাখা। তাছাড়া আশুরা, শবে বরাত,
মিরাজ ইত্যাদির রোযা রাখা।
৪. নফল রোযা। যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাঁচ দিন ব্যতীত যে কোনো দিন আল্লাহা নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা।
৫. মাকরূহ রোযা। যেমন- অনবরত রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা।
৬. হারাম রোষা। যেমন- বছরে নিষিদ্ধ পাঁচ দিন রোযা রাখা।

(مُفْسِدَاتُ الصَّوْم :
রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ : রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ নিম্নরূপ-
১. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পানাহার করা।
২. স্ত্রীসহবাস করা।
৩. স্ত্রী চুম্বন দ্বারা বীর্যপাত হওয়া।
৪. ইচ্ছা করে মুখভর্তি বমি করা।
৫. পাথর, লোহার টুকরা বা ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেলা।
৮. ঢুস নেয়া।
৬. ইচ্ছাকৃতভাবে গুহ্যদ্বার বা যৌনপথ দিয়ে যৌন সম্ভোগ করা।
৭. ইচ্ছাপূর্বক এমন জিনিস পানাহার করা, যা খাদ্য বা ওষুধরূপে ব্যবহার হয়।
৯. কান বা নাকের ভিতর ওষুধ দেয়া।
১০. ধূমপান, লোবান এবং হুক্কা ইত্যাদির ধোঁয়া শুকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

রোযাদারের আদবসমূহ: রোযাদারের জন্য কতিপয় আদব রয়েছে। যেমন-
১. রোযাদার অতিরিক্ত কথা বলবে না।
২. অপ্রয়োজনীয় কথা কাজ বর্জন করবে।

৩. কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করবে না। কেউ ঝগড়া করতে আসলে "আমি রোযাদার" বলে তাকে বিদায় দেবে।

৫. মিথ্যা কথা না বলা।

৪. বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির আযকার করবে।

৬. কারো সমালোচনায় লিপ্ত না হওয়া।

৭. রোযার হক যথাযথভাবে আদায় করা।

৮. স্ত্রীর সাথে যৌনালাপ থেকে বিরত থাকা।

৯. অশ্লীল ও অশালীন ছবি চিত্র দেখা থেকে বিরত থাকা।

১০. মুখ দিয়ে কোনো কিছু স্বাদ গ্রহণ না করা। তবে স্বামী অশালীন কথা শোনার আশঙ্কা থাকলে তরকারির স্বাদ গ্রহণ করা যাবে।

১১. গরম বা রোদের কারণে বারবার কুলি করা যাবে না।

১২. অধিক উষ্ণতার কারণে গায়ে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখা যাবে না।

১৩. বেশি বেশি দানসাদকাহ করা উচিত।

১৪. রোযাদারের জন্য শরীয়ত নির্দেশিত সকল অবৈধ কাজ এড়িয়ে চলতে হবে।

১৫. যথা সময়ে সাহরী ও ইফতার গ্রহণ করা প্রভৃতি।

আদর্শ সমাজ গঠনে রোযার ভূমিকা

স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে মাঝে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে রোখা অন্যতম মাধ্যম। রোযার ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিক থেকে বহু গুরুত্ব রয়েছে।

নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা: সিয়াম সাধনার মাধ্যমে একজন বিত্তশালী নিরদ্রের ক্ষুরার যন্ত্রণা অনুধাবন করতে পারে। ফলে তার মাঝে গরিবদের প্রতি সহানুভূতিও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। রাসূল (স) বলেন- شهر رَمَضَانَ شَهْرُ الْمُواساة

২. সাম্য প্রতিষ্ঠা: ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম রোযার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। ধনী গরি আমির ফকির সবাই একসাথে তারাবীহর নামায পড়ে, ইফতার করে। এতে বিরাট
সাম্যের ছবি ভেসে ওঠে।

৩. সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ: রোখা সমাজের অবহেলিত, দিনমজুর মানুষের প্রতি উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। রাসূল (স) রমযান মাসে শ্রমিকের কাজ কিছুটা হালকা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন- تدل علف من مملؤي غفر الله له

৪ . আর্থিক উন্নতি: রোযার মাসে ধনীদের যাকাত, ফিতরা, দান সদকার মাধ্যমে সমির অভাবগ্রস্তদের আর্থিক উন্নতি হয়।

৫. পরিচ্ছন জীবনের প্রতিশ্রুতি:
সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে রোযাদারের লোভ লালসা ও অন্যায় অনিয়মের পরিবর্তে সততার ওপর ভিত্তি করে জীবনযাপন করতে হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, সিয়ামই পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি।

৬. ধৈর্যধারণের শক্তি যোগায়: মহানবী (স) বলেন, রমযান ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত। ধৈর্য কেবল পারিবারিক ক্ষেত্রেই নয়। বরং সামাজিক পরিচফলে এক অনন্য মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ফলে সমাজে শান্তি ও ইনসাফের পরিবেশই হয়।

৭. ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি: রোযার মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। রোযার মাধ্যমে গরিবের দুঃখ অনাহারের কষ্ট উপলব্ধিত করতে পারে। এক রকম সুখ দুঃখ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।
৮. তাকওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি: রোযার মাস সমগ্র পরিবেশকে তাকওয়ার ভাবধারায় উজ্জ্বল করে তোলে। এ সময় মানুষ গুনাহের কাজ করতে স্বভাবতই লজ্জা পায়। ফলে সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেন গোটা সমাজ এক নির্মল ও পবিত্র আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

৯. নৈতিক বিকাশ সাধন: রোযার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয়। একজন রোযাদার ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে থাকে। সে কোনো অন্যায় অশ্লীল কাজের প্রতি হাত বাড়াতে ভয় পায়।

১০. ঝগড়াবিবাদ থেকে মুক্তি: রোযাদার যাবতীয় ঝগড়াবিবাদ থেকে নিজেকে সাংঘত রাখে। রোযার কল্যাণজনিত এ সংযমের ফলে সমাজ অনেক দ্বন্দ্ব কলহ থেকে পরিত্রাণ পায়।

১১. আদর্শ সমাজ গঠন: সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ ষড়রিপুর তাড়না থেকে পরিত্রান পায়। যার ফলে লোভলালসা, কামনা বাসনা, ক্রোধ, নেশা, মিথ্যা, প্রতারণা এক অশ্লীলতার চর্চা থেকে পূতপবিত্র হয়ে সে একটি সুন্দর ও আদর্শ জীবন লাভ করে। জীবনের প্রভাব যে সমাজে পড়ে সে সমাজ একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ হিসের গড়ে ওঠে। সুতরাং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম।

রোযার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব:

রোযার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব সীমাহীন। যেমন:

১. তাকওয়ার প্রশিক্ষণ: সাওম তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। একজন মুমিন রোযার যাবতীয় নিয়মনীতির দাবি রক্ষাপূর্বক রোযা আদায় করলে যে অবশ্যই তাকওয়াবান হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- يالهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلَّكُمْ تَتَّقُون .

২. আধ্যাত্মিক শক্তির সোপান: সাওম মূলত আত্মিক শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অন্যতম। সোপান। রোযার আত্মিক শিক্ষা প্রকৃত রোযা পালনকারীর সমগ্র জীবনে কল্যাণরঃ প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ তায়ালার বাণী وَالرَّقْدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الزاد التقوى

৩. আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন: রোখা একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন। রোযার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যলাভের সুযোগ লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা الصوم لي وَأَنَا أَجْزِي بِه

৪. রোযা ঢালস্বরূপ: শয়তানের প্রবঞ্চনা, কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য রোর ঢালস্বরূপ। রোযা রাখলে বান্দা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারে। রাসূল (স) বলেন- الصوم جنة

৫. রোযা গুনাহ মার্জনাকারী: রোযা রাখলে রোযাদারের অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাই ক্ষমা করা হয়। মহানবী (স) বলেন-

من صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه .

৬. ইবাদতে অনুভূতি সৃষ্টি: রোযা মানুষের চিন্তা চেতনা এবং অনুভূতিতে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার সুদৃঢ় করে। রোযার মাধ্যমেই বান্দা স্বেচ্ছায়। মহান আল্লাহর ইবাদতের প্রতি গভীর মনোযোগী হয়।

৭. রোযা মুক্তির উপায়: কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। যেমন রাসূল (স) বলেন- يقول الصيامُ أَي رَبِّي إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي.

৮. আরশের ছায়ায় স্থানলাভ ভয়াবহ হাশরের ময়দানে যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন রোযাদারগণ আল্লাহর আরশের নিচে স্থান লাভ করবে।
৯. নৈতিকতার প্রশিক্ষণ: রোযা নৈতিক চরিত্রের এক উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ। রোযাদার ব্যক্তির অন্যায়ের প্রবণতা হ্রাস পেয়ে ভালো কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। রোযাদার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু নিয়ন্ত্রণ করে সত্যিকার নৈতিকতার উচ্চ শিখরে উপনীত হতে সক্ষম হয়।

১০. মনোবল ও সাহস সঞ্চারকারী: রোযা রাখলে পাকস্থলী পরিষ্কার হয় এবং হজম শক্তিবৃদ্ধি পায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। এতে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, মনোবল ও সাহস বৃদ্ধি পায়। ফলে সে বীরবিক্রমে সৎকাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

১১. নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ: সিয়াম সাধনা রোযাদারকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। সাওম নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, ইফতার করা, তারাবীহ নামায আদায় করা, সাহরী খাওয়া ইত্যাদি নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে সে সময়ের মূল্য অনুধাবন করে দৈনন্দিন কার্যাবলি ঠিকমতো পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।
১২. সহনশীল করে তোলে: রোযা রোযাদারকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শক্তি যোগায়। সকল প্রকার পানাহার ও সুন্দরী স্ত্রী কাছে থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে রোবাদার সঙ্গম থেকে বিরত থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, সিয়াম মানুষকে কত ধৈর্যশীল ও সহনশীল করে গড়ে তোলে।

উপসংহার: রোযার ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে সরাহভীতি সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ বিভিন্ন পাপাচার থেকে দূরে থেকে সৎকাজের প্রতি ধরিত হয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, রোযার এ মহান শিক্ষাকে উপলব্ধি করা। তাই প্রায়ার প্রতি সকলেরই যত্নবান হওয়া অপরিহার্য।

[সাওম তথ্যসূত্র:আল ফাতাহ ফাযিল (স্নাতক) পাস স্টাডি সিরিজ: ইসলামিক স্টাডিজ ৩য় পত্র, তৃতীয় বর্ষ । ১৫৩-১৫৬ পাতা]

যাকাত

উপস্থাপনা:

মহান আল্লাহর ঘোষণা- أَقِيمُوا الصلوة وأتُوا الزَّكوة

ইসলামের তৃতীয় ও অন্যতম স্তম্ভ বা রোকন হলো যাকাত। এটি ইসলামী অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যাকাতের গুরুত্ব সীমাহীন। ধর্মীয় দিক থেকে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। শুধু দারিদ্র্যবিমোচন নয়; বরং অর্থনীতির গতিপ্রবাহ সচল রাখার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশ্নের চাহিদানুযায়ী পরিচয়সহ যাকাতের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

যাকাতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ: যাকাত শব্দটি زَكَّى অথবা زكر থেকে নির্গত।

১. زَكَى الزَّرْعُ إذا نَنَا -তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা হয়زَكَّى

২. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَى তথা পবিত্রতা। এ অর্থে কুরআনে এসেছে ُالطَّهَارَة

৩. زَكَتِ الْبُفْعَةُ إِذَا يُورث فيها -তথা البركة

৪. زَكَى نَفْسَهُ إِذَا حبًا -তথা প্রশংসা। যেমন বলা হয় ُالْمَدْح

৫. الخ তথা জবাই করা।

৬. আবু আলী (র) বলেছেন, যাকাত অর্থ বস্তুর নির্যাস।

এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

১. শরীয়তের পরিভাষায় الزَّكَاةُ فِي تَعْلِيكُ جُزْء قال عثئه خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا . الشَّارِعُ فَقِيرًا مُسْلِمًا غَيْرَ مَا شِمِي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك. অর্থাৎ, যাকাত বলা হয় হাশেমী বংশোদ্ভূত ও তাঁদের গোলাম ব্যতীত অসহায় মুসলমানকে তার থেকে কোনো ধরনের উপকারিতার আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের অধিকারী বানানো।

২. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- الزكاةُ مِن تَمْلِيكَ جُزء مَالَ عَيْنَهُ الشَّارِعُ لِمُسْلِمِ فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِنُ وَلَا موْلاهُ مَعَ قَطْعِ الْمُنْفَعَةِ عَنِ الْمُمْلَكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى . অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টির

উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।

৩. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- فِي اخْرَامُ حُرو معين من الثورة المملوكة كل
سنة حيت آناء الشريفة অর্থাৎ স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয়।

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে- الزَّكَاةَ إسم إِمَّا يُخْرِجُهُ الإِنْسَانُ مِن حق الله تعالٰى অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়।

৫. আল্লামা কোজলানী (র) বলেন
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা।

৬. আল্লামা আইনী (র)-এর ভাষায়- اكاة الثاء جزء من النصاب بعد حَوْلان
الْحَوْلِ إِلَى فَقِيْرٍ غَيْرِ مَا شِمِي. সম্পদ ব্যক্তি মালিকান একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর, তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত
অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত।

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন-
ْنَاهُ فِي حِصَّةٌ مِنَ الْحَالِ وَنَحْوِهِ يُؤْحِبُّ الشَّرْعُ يَذْلَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِم

৮. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) ব الزَّكَاةُ حَقَّ يَنْبُتُ فِي الْمَال ِ অর্থাৎ, যাকাত সম্পদের এক আবশ্যকীয় অধিকার।

যোটকথা, কোনো স্বাধীন, সুস্থ, জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচারে দায়মুক্তভাবে কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা প্রদান তৎসমপরিমাণ অর্থসম্পদ অতিরিক্ত থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে, তাহলে তার সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে।

مصارف الزكاة و :

যাকাত বন্টনের খাতসমূহ: যাকাত বণ্টনের খাতসমূহকে শরীয়তের পরিভাষায় তা মা বলা হয়। সবাইকে যাকাত দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্র মিষ্টি

করে দিয়েছে। যাকাত বণ্টনের খাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন। إِنَّمَا الصدقة للفقراء والمسكين والعملينَ عَلَيْهَا والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله

عليم حكيم . অর্থাৎ, যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, অল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত ব্যয়ের মোট আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে, নিচে তা আলোচনা করা হলো-

১. ফকির: যাদের অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন দুঃখকষ্টে অতিবাহিত হয় লোকলজ্জায় কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না, তাদেরকে ফকির বলে। যাকাত দিয়ে দরিদ্র, অভাবী, ফকির শ্রেণির পুনর্বাসন, বেকারত্ব দূর করে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

রাসূল (স) বলেন, যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।
২. মিসকিন: মিসকিন বলতে দৈহিক অক্ষম ব্যক্তিদের বোঝায়। যেমন- আছ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণিকে মিসকিন বলা হ মিসকিনদের মাঝে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হলে তারা আর মিসকিন থাকবে না।

৩. যাকাত আদায়কারী কর্মচারী: যারা যাকাত আদায় ও বণ্টন করে তাদের বেতনভাতা হিসেকে

হিসেবে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

৪. নওমুসলিমদের সংরক্ষণ ও মন আকৃষ্ট করা: যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত নওমুসলিমদের মন আকৃষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। সকল লোক সম্প্রতি ইসার

রাসুল (স) এক সময় নওমুসলিমদের সম্পকে বলেন, এ দীক্ষিত হয়েছে। তাই আমি তাদেরকে পরিতুষ্ট করতে চাই। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ঘরে

৫. দাসত্ব মোচন: যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে করা যায়। কোনোভাবে জিম্মি বা বন্দি হয়, তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যর্থ হই

৬. ঋণগ্রস্ত: অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য ঋণ করে, কিন্তু তা পরিশোধে তাদের ঋণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

৭. আল্লাহর পথে ব্যয়: দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলে। আল্লাহর যমীনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর অন্যতম নির্দেশ।

৮. মুসাফির: কোনো মুসাফির যদি সফরে অর্থ সমস্যায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের অর্থ দ্বারা সাহায্য করা যায়। মুসাফির ধনী হলেও বিপদে যাকাত পাওয়ার যোগ্য।

যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. যাকাত ফরয ইবাদত: ইসলামের অন্যান্য ফরয হুকুমের ন্যায় যাকাতও একটি ফরয হুকুম। যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর বাণী- تَبْمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكوة

২. ইসলামের রোকন: ইসলামের পাঁচটি রোকনের অন্যতম রোকন হলো যাকাত রাসূল (স)-এর বাণী-

من الإسْلامُ على خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ انام الصلوة وإيتاء الزكوة الخ.

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন: কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ঈমানী জীবনে একান্ত কামনা। সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আল্লাহ তায়ালার বাণী- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله

৪. আর্থিক ইবাদত: যাকাত হলো ইসলামের আর্থিক ইবাদত। কারণ অর্থসম্পাদ নির্দিষ্ট একটা অংশ আল্লাহর রাস্তায় নিঃশর্তভাবে দান করার নামই যাকাত।

৫. জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়: যাকাত জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়। কেনন যাকাত প্রদান না করলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৬. তাকওয়ার গুণ অর্জন: যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়। কে প্রতি সম্মান দেখিয়েই নিজের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করে। আর আল্লাহকে ভয় করে কোন কাজ করার নামই তাকওয়া।

৭. আত্মিক শান্তি লাভ: ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। আল্লাহর হুকুম ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর্থিক ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে আত্মিক প্রশান্তি।

৮. সফলতার চাবিকাঠি যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারে।

১৯. ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ: মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা নেন,মুমিনরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। যাকাতপ্রথা সম্পদশালীদের জন্য একটি ঈমানী পরীক্ষা।

১০. যাকাত আদায়ের মাধ্যমে বাক্তির চরিত্র যেমন পবিত্র হয়, তেমনি সম্পদও পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়।

১১. আল্লাহর নেয়ামতের শোকর:
ধনসম্পদ আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। আর নেয়ামতের শোকর করাই ঈমানদারের একান্ত কর্তব্য। যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই নেয়ামতের শোকর আদায় হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- واشكروا لى ولا تكفت

الْأَهَمِّيَّةُ الاجْتِمَاعِيةُ لِلزَّكَاةِ و

যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব: যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব নিম্নরূপ-
ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে: বাকাত ধনীদরিদ্রের ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি করে। যাকাত দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা নয়: বরং ধনী-দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য দূর করে। এটি সম্পদে দরিদ্রের অধিকার। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُوم

১.সামাজিক নিরাপত্তা বিধান: সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সমাজের যে সকল লোক অর্থ উপার্জনে অক্ষম এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, যাকাতব্যবস্থা তা দূরীকরণে অনন্য ভূমিকা রাখে।

২.অভাব অনটন বিমোচন: অভাব অনটন বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজস্থ ধনী শ্রেণি যদি সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করে, তাহলে সমাজে কোনো অভাবী মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৪. সামাজিক অনাচার নির্মূল: অর্থের অভাবে মানুষ সামাজিক অনাচার তথা চুরি, ঢাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাস ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ভেঙে পড়ে সামাজিক অবকাঠামো। যাকাত ব্যবস্থা এসব সামাজিক অনাচার নির্মূলে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

৫. ভাতৃত্ববোধ জাগরণ: যাকাত মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ধনীদরিদ্রের মাঝে এক গভীরতম ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। রাসূল (স)-এর বাণী- الزَّكوة تَنْطَرَةُ الإسلام

৬সহানুভূতি সৃষ্টি: যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীদের অন্তরে দরিদ্রদের প্রতি চরম সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। ধনীরা দরিদ্রদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে আসে।

৭. জনহিতকর কার্যাবলি: যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে সমাজের অসংখ্য জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়।

৮. ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ: ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। যাকাতের অর্থ দিয়ে দবিদ্র কল্যাণ ও দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করা যায়।
الأهمية الاقتصادية للزكاة :

৯.ইসলামী অর্থনীতির মূলভিতি: যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূলভিত্তি। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি যেমন সুদ, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি যেমন জাতীয়করণ, তেমনি ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো যাকাত।

১০ . যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

১১.রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস: ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস যাকাত। ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহভাগ অর্থই যাকাত থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

১২.জাতীয় আয় বৃদ্ধি: যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয় আয়কে বৃদ্ধি করে। রাষ্ট্রের অন্যান্য খয়ের সাথে যাকাতের অর্থ একত্রিত হয়ে জাতীয় আয় বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
কোনো রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে যাকাত।

১৩.অর্থনৈতিক ভারসাম্য দূর: রাষ্ট্রে ধনী দরিদ্রের মাঝে যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে ইসলাম যাকাতব্যবস্থা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা নিরসন করে এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলে।

১৪. অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ: যাকাত অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের মহৌধ কেননা যাকাতব্যবস্থার কারণে বিত্তশালীদের অর্থ একস্থানে সঞ্চিত থাকতে পারে না সম্পদ সমাজের দরিদ্রদের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে।

১৫. দারিদ্র্যবিমোচন: দারিদ্র্যবিমোচনে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সঠিকভা যাকাতের অর্থ দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করলে সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূর হতে বাধ্য।

১৬.. ঋণমুক্তি: যাকাতের অর্থে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঋণমুক্ত করা যায়।

১৭. চাকরির সুযোগ: রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত উত্তোলন ও বিতরণের ব্যবস্থা করল যাকাতবিভাগে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১৮. পুঁজিবাদের অবসান: যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে জা মুক্তি লাভ করবে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার এ মূলনীতিকে সামনে রেখেই আয়া كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ - GIS CARS

১৯. বেকারত্ব দূরীকরণ: বেকার জীবন অভিশপ্ত জীবন। ইসলামের যাকাতব্যবস্থা সম থেকে বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাতের অর্থ দিয়ে বেকা লোকদের কোনো না কোনো কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

২০. অর্থনৈতিক প্রতারণা বন্ধ: যাকাতব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রচলিত অর্থনৈতি প্রতারণা বন্ধ করা যায়। আধুনিক করব্যবস্থায় ফাঁকির প্রবণতা থাক যাকাতব্যবস্থায় ফাঁকি অকল্পনীয়। কেননা বিত্তশালীরা একান্তই ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় যাকাত দিয়ে থাকে।

২১. কর্মসংস্থানের সৃষ্টি: যাকাতের অর্থ একত্রিত করে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ অনেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। মাঝে।

২২. সমবায় সমিতি পঠন: যাকাতের অর্থ একত্রিত করে দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে। সমবায় সমিতি গঠন করে দেয়া যায়, তাহলে এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উন্নত হবে।

২৩. জনকল্যাণমূলক কাজ: যাকাতের অর্থে এতিমখানা, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎস ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করা যায়।

উপসংহার: ইসলামে যাকাতব্যবস্থার গুরুত্ব সীমাহীন। যাকাতের যেমন রয়েছে আধ্যা তথা ধর্মীয় গুরুত্ব, তেমনি রয়েছে পার্থিব তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।
[যাকাত এর তথ্যসূত্র: আল ফাতাহ সিরিজের ইসলামিক স্টাডিজ ৩য় পত্র,ফাযিল(ডিগ্রী) ৩য় বর্ষ]

হজ্জ:

উপস্থাপনা: বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ইসলামী মহাসম্মেলন হলো হজ্জ। পবিত্র কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের সুদূর প্রান্তসমূহ থেকে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ হৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগজড়িত চিত্তে মক্কায় হাজির হয় এবং সম্পাদন করে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি। মূলত হজ্জ মুসলিম জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ঐক্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। নিম্নে প্রশ্নালোকে হজ্জের পরিচয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

এর আভিধানিক অর্থ: ২ শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায়। যথা-

ক. মাসদার হিসেবে বর্ণে যবর দিয়ে তাঁ; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

الحَج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَة. ٌ

খ. হিসেবে বর্ণে যের দিয়ে; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْت. ِ

হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো-

.. ُالْقَصْدُ وَالْأَرَادَة তথা ইচ্ছা ও সংকল্প করা।

২. الزيارة তথা সাক্ষাৎ করা।

... ٍالْقَصْدُ إِلَى شَيْءٍ عَظِيم থা মহান কোনো কিছুর ইচ্ছা করা।

৪. ِالْقَصْدُ لِلنَّسْك তথা হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা।

৫. নেহায়া গ্রন্থকারের ভাষায়- القد إلى شيء خط অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো

কিছুর সংকল্প করা।

৬. গমন করা। ৭. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া।

৮. ইংরেজিতে এর অর্থ হলো- To make decission. To meet ইত্যাদি। মতে-

১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. ْجَوَاهِرُ الْفِف গ্রন্থকারের মতে-

الْمَعِ هُوَ زِيَارَةُঅর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পন্থায় নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ। مَكَانٍ مَخصُوص في وقت مخصوص بِطَرِيق مَخصُوص.

২. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার ভাষায়-

مونَقْدُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِلتَّقَرُبِ إِلَى اللَّهِ بِأَفْعَالِ تَخْصُومَةٍ فِي زَمَانِ مَخصُوص অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যনে সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ।

৩. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকারের মতে-الفع هو القَصْدُ إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال

الخُصُوصَةِ فِي زَمَانِ مَخصُوص

৪. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- ِالْحَيُّ هُوَ قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِأَدَاءِ أَفْعَالٍ مَخْصُوْصَة

৫. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন-

الْحَيُّ هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخصُوص فِي وَقْتٍ مَخصُوصِ بِطَرِيقِ مَخصُوص

بِأَفْعَالِ مَخْصُوصَة. ِ

* ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়-

هُوَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ مَعَ الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةً فِي وَقْتٍ مَعْلُوم. ِ

৭. শরহে বেকায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন-

الْحَيُّ هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخصُوصِ فِي وَقْتِ مَخصُوص. অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে।

৮. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে-

هُوَ الْقَصَدُ فِي اشْهُرٍ مَعْلُومَاتٍ إِلَى البَيْتِ الْحَرَامِ لِلنَّسُكِ أو الْعِبَادَة . অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ শরীফ যেয়ারত এফ যেয়ারত করার ইচ্ছা

পোষণ করাকে হজ্জ বলে।-সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করার নামই হজ্জ।

যার উপর হজ্জ ওয়াজিব :

উপস্থাপনা: বিশ্বমুসলিম ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ইসলামী মহাসম্মেলন হলো হচ্ছ। এটি সকল মুসলমানের ওপর ফরয নয়। কতিপয় শর্তসাপেক্ষে হজ্জ ফরয হয়। নিম্নে পহজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলি ও আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

হজ্জ যার ওপর ওয়াজিব: হজ্জ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ولله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا 2011 উদ্ধৃত আয়াতের إستطاع শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তাফসীর ও ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, নিম্নোক্ত শর্তাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকবে তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব। যেমন-

১. الاسلام: মুসলমান হওয়া। কেননা অমুসলিমের ওপর ইসলামী বিধি প্রযোজ্য নয়। যেমন আল্লাহর বাণী- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يُقْرَبُوا المَسْجِد الحرام

২. : হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে ২৫% তথা ব্যক্তি স্বাধীন হওয়া। কেননা কোনো দাসদাসীর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

عَبْدًا مملوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

.. مُكلف بالشرع : প্রাপ্তবয়স্ক ও স্থির মস্তিষ্ক হওয়া। কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন হাদীসে এসেছে

رفِعَ الْقَلَمُ مِنْ ثَلاثٍ عَنِ الصَّبِيُّ حَتَّى يَبْلُغ.

৪. সুস্থ হওয়া। স্বাস্থ্যগতভাবে পূর্ণ সুস্থ না হলে তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহর বাণী- لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَلا عَلَى الْمُرْضى

: দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া। কেননা অন্ধ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। যেমন ৫.البصارة
আল্লাহর বাণী-لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى خرج

৬. মতো: পথ খরচ থাকা। আর সম্পদের পরিমাণ এতটুকু হতে হবে, যাতে আসা যাওয়ার সমস্ত খরচের পর বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে পারে। যেমন আল্লাহর বাণী-

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

امن الطريق ؟ : হচ্ছে আসা যাওয়ার পথ নিরাপদ হওয়া, শত্রুমুক্ত হওয়া এবং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকা।

* الزوج أو المَحْرَمُ لِلمَراة : ةহলার সাথে স্বামী বা মুহাররাম পুরুষ থাকা। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- لا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعْهَا تظلم

* Up: যানবাহনের সুবিধা থাকা।

১০.دفع القَلَمُ مِنْ ثَلَاثَةٍ উড়তা: জানবান হওয়া। কেননা পাগলের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।
عَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يُفيق

হজ্জের গুরুত্ব:

১. ঐক্য ও সংহতির বন্ধন: সমগ্র মুসলিম জাহানকে কোনো বিশেষ ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ হচ্ছের সময় একত্র হয়ে পারস্পরিক আলাপআলোচনা ও ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে ঐক্য সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারেন। ড. লেনার

বলেন- The demonstration of equality furnished on the occation of Han complete that, it is well high impossible to distinguish a servent from a master ২. আন্তর্জাতিক ঐক্য সৃষ্টি: আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু সম্মিলিতভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। হজ্জই মুসলমানদের মাঝে আন্তর্জাতিক ঐক্য আনয়ন করতে পারে।

৩. বিশ্বসম্মেলন: হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশ্বসম্মেলন। মুসলমান হজ্জের দিনগুলোতে দুনিয়ার সকল প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘর যেয়ারত করার জন্য মিলিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হজ্জের এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ মুসলমান পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্রিত হয়। এ সময় তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদানপ্রদান ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

৫. পারস্পরিক কল্যাণ কামনা: হজ্জের অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পিত মানুষ পরস্পরে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ কামনা করে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সুখ, সমৃদ্ধি সকলেই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। ও শান্তি কামনার

৬. শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত: সমগ্র বিশ্বের মুসলমান হজ্জের প্রতিটি কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন করে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দেয়। সমাজজীবনে এ শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব সীমাহীন।

৭. ভাবের আদানপ্রদান: হজ্জে সম্মিলিত মুসলিম জনতা পরস্পরের মাঝে ভাবের আদানপ্রদান করে। ফলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হয়।

৮. ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি: হজ্জ বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, আয়ার ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের একটি সুবর্ণ সুযোগ। এটা মুসলমানদের ভাবগত, কৃষ্টিগত প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

মহান আল্লাহর বাণী- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم

৯. আন্তর্জাতিক জ্ঞানলাভ হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ পায়। অন্যান্য দেশের কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা জন্মে। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হয়।

১০. শৃঙ্খলা আনয়ন হজ্জের মৌসুমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের লোকেরা হজ্জের কার্যাবল নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন করে শৃঙ্খলার অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। আন্তর্জাতিক জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

১১. পারস্পরিক উন্নতি বিধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন: হজ্জ সম্মেলনে উপস্থিত বিনির মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ধর্মীয় আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্তগ্রহা ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ রচনা করতে পারে।

১২. বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি: মুসলমানদের আন্তর্জাতিক জাতিসত্তার মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো হজ্জ। এটা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের জয় ঘোষণা করে। মহান আল্লাহর ঘোষণা- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَة

১৩. বিশ্বে নেতৃত্ব প্রদান: বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে ইসলাম এখন অনেক দূরে। ইসলামকে পুনরায় সে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হলে প্রয়োজন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সুদৃঢ় নেতৃত্ব প্রদান।

১৪.সাম্যের বিকাশ সাধন: হচ্ছে উঁচু নিচু, রাজা প্রজা, মনিব ভৃত্য, আরব অমারব, ধনী দরিদ্র সকলে একই প্রকারের পোশাক পরিধান করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, ভেদাভেদের সকল প্রাচীর ভেঙে সাম্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান প্রভুর বিধান পালন করে থাকে। হজ্জ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো অনুষ্ঠানে সাম্যের এ নজির পরিদৃষ্ট হয় না।

১৫. অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন: ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার রয়েছে। এ বিধান "খ্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবেও প্রযোজ্য। তাই হজ্জ মৌসুমে রাষ্ট্রপ্রধানগণ অনগ্রসর রাষ্ট্রসমূহের প্রতি তাদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

১৬. বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হজ্জ এক অনন্য সাধারণ মাধ্যম। ১৭. দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি: বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ দীন কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই। দীনের পথে অগ্রসরমান রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ হজ্জ মওসুমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দের সাথে ঐকমত্যে একক কর্মসূচির মাধ্যমে দীন কায়েমের পথে এগিয়ে আসতে পারে।

১৭ বৈষম্য দূরীকরণ: হজ্জ বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি। এটা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভূত করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন- No other institution in the world has the wonderful influence of the Hajj in levelling all distinctions of race, colour and rank.

১৮. আল্লাহর নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ: আল্লাহর বাণী- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়।

উপসংহার: হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ইবাদত। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয় বলে এর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম। হজ্জ মুসলিম উম্মাহর মহামিলনের মহোৎসব।

[হজ্জ এর তথ্যসূত্র:আল ফাতাহ ফাযিল (স্নাতক) পাস স্টাডি সিরিজ: তৃতীয় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ ৩য় পত্র]

পর্দা:

উপস্থাপনা: আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণকর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের এক হিজাব তথা পর্দাব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাই তো সামাজিক অন্যায় ও লাভের পাশাপাশি দাম্পত্য জীবনকে সুখী এবং প্রীতিপূর্ণ করার নিমিত্ত আল্লাহ তায়ালা পর্দাকে ফরয করে দিয়েছেন। ও ব্যভিচার হতে মুক্তি

تَعْرِيفُ الْحِجَاب. ِ:

حجاب -এর পরিচয় : حجاب-এর পরিচয় নিম্নরূপ-

আভিধানিক অর্থ : حِجاب একটি পারিভাষিক শব্দ। এটি বাবে -এর মাসদার। যা حب মান্দাহ হতে নিঃসৃত। জিনসে صحيح: শব্দটির অর্থ হলো- ১. পর্দা, ২. আবরণ, ৩. আচ্ছাদন, ৪. ঘোমটা, ৫. অন্তরায়, ৬. আড়াল, ৭. লজ্জাশরম, ৮. বোরকা,৯. বোরকা, লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে পর্দা বলতে নারী ও পুরুষের বিশেদ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ঢেকে রাখা বা আবৃত করাকে বোঝায়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরীয়তের পরিভাষায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে। নারীপুরুষ উভয়ের নিজ নিজ রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্যকে একে অপরের নিকট হতে আড়াল রাখার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে তাকে হিজাব বা পর্দা বলা হয়। ঢেকে রাখার নামই হিজাব বা পর্দা। এক কথায়, ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারীপুরুষ প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ

পর্দা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ: পর্দা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা হলো-

ا وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلوةَ وَأَتِينَ

الزكوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَه. ُ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَلُوهُنَّ مِنْ قَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ . يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا

عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون. َ

:حَقِيقَةُ الْحِجَابِ فِي الإِسْلام.

ইসলামে পর্দার স্বরূপ: পর্দাপ্রথা ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ইসলামে এর তাৎপর্য অপরিসীম। নিম্নে পর্দার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ক. ঘরোয়া জীবনে পর্দা: সাধারণত নারীদের দৈনন্দিন জীবনে আবাসস্থল হলো নিজ নিম্ন বাসগৃহ। মূলত বাসগৃহে অবস্থানই নারীদের প্রকৃত শোভা। তাইতো মহাগ্রন্থ আল কুরআনে وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

ঘরের অভ্যন্তরে নারীগণ স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ঔরসজাত ছেলে, সহোদর ভাই প্রমুখের সাথে দেখা দিতে পারবে। এছাড়া অন্যদের সাথে বিনা প্রয়োজনে কস্মিনকালেও দেখা দিতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو ابناء من أو أثناء بعولتهن للخ.

ঘরোয়া পরিবেশে নারীদেরকে আকর্ষণীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন স্তনযুগল, বাহু, পেশী, পৃষ্ঠদেশ, উরস্তা, নিতম্বদেশ ইত্যাদি চিলাচালা বস্ত্রাবৃত রাখতে হবে: যাতে ভাবাবেগ তাড়িত আপনজনের মনে কোনো ছাপ না পড়ে। একান্ত অবস্থানে নারীর জন্য ঘরোয়া পরিবেশে প্রয়োজনে কোনো কোনো অঙ্গ অনাবৃত করার অনুমতি আছে। এজন্যই একান্ত অবস্থান ক্ষেত্রে পুরের জন্যও মায়ের গৃহে প্রবেশের অনুমতি গ্রহন করতে হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, জনৈক যুবক বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে আঁাঁটা ব্যতীত মায়ের ঘরে প্রবেশের ওপর তিল ধরলে রাসূল (স) তাকে ক্রোধস্বরে বললেন- ' َأَتُحِبُّ أَنْ تَرَى أَحْك তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে?

খ. ঘরের বাইরে পর্দা: ঘরে অবস্থানকালে পর্দা করা যেমন ফরয, তেমনি ঘরের বাইরেও পর্দা করা ফরয। ঘরের বাইরে পর্দা করার কতিপয় পন্থা রয়েছে। যেমন-

১. শালীনতা বজায় রেখে চলা: ইসলাম বিশেষ প্রয়োজনে নারীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তবে জাহেলী যুগের নারীদের মতো কিংবা পাশ্চাত্য নারীদের ন্যায় উলঙ্গভাবে চলাফেরা করতে পারবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং শাস্তির বিধান রেখেছে। তাই বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

يبنى أتمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَّاتِكُمْ وَرِيْشًا - وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى الآية.

২. সর্বাঙ্গ ঢেকে বের হওয়া: বাইরে বের হওয়ার সময় মেয়েদেরকে সর্বাঙ্গ ঢেকে বের হতে হবে। তবে হাত ও পা খোলা রাখার অনুমতি আছে। যেমন সূরা আহযাবে বলা হয়েছে- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِن.َّ

৩. সৌন্দর্য গোপন রাখা: নারীগণ ঘরের বাইরে চলার সময় তাদের রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য গোপন রাখতে হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْآيَة . অর্থাৎ, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

৪. দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ রাখা: খারাপ চিন্তাচেতনায় প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করে অন্যায় ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত করাতে চক্ষুদৃষ্টির ভূমিকা সর্বাগ্রে। তাই তো সমাজকে কলুষমুক্ত রাখার মহান লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা চোখের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে নারীপুরুষ উভয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ الخ.

أهمية الْحِجَابِ فِي الْمُجْتَمَع:

পর্দার সামাজিক গুরুত্ব:

পর্দাব্যবস্থা ইসলামের সার্বক্ষণিক অপরিহার্য বিষয়। পর্দার
মূল্য হচ্ছে, নারীপুরুষ অবাধ মেলামেশা করবে না; বরং নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা সীমাবদ্ধ থাকবে। পরপুরুষের সংস্পর্শ থেকে নারী এবং পরনারীর সংস্পর্শ থেকে পুরুষ দূরে থাকবে। কারণ নারীপুরুষকে এমন বিপরীত উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা উভয়কে একে অপরের প্রতি আকর্ষণ করে, পারস্পরিক স্বাভাবিক যৌনবোধ জাগ্রত করে এবং শেষ পর্যন্ত অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাই ব্যভিচার ও অনাচারের পথ বন্ধ করার জন্য এবং তা কঠোরভাবে প্রতিরোধকল্পে ইসলাম পর্দাব্যবস্থা অপরিহার্য করে দিয়েছে। পর্দাব্যবস্থা না থাকলে অবাধ চলাফেরা মেলামেশার ফলে নারীপুরুষ তাদের মধ্যকার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা শয়তানের প্ররোচনায় ইতর প্রাণীর ন্যায় যেখানে সেখানে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ত, সমাজসভ্যতা ও সামাজিক পবিত্রতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ত, আর মানবসমাজ। ধ্বংস হয়ে যেত। নারীপুরুষের ইজ্জত আব্রু ও মানসম্মান রক্ষা এবং সামাজিক শান্তি পূতপবিত্র নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য ইসলামে পর্দাব্যবস্থার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা মানবসভ্যতার পরিপন্থী। জাহেলী যুগে এ পর্দাপ্রথান থাকার কারণে নারীরা ছিল নিগৃহীতা, নির্যাতিতা এবং পুরুষের ভোগের সামগ্রী। ইসলাম পর্দাব্যবস্থা চালু করে নারী জাতিকে সম্মান দিয়েছে এবং অনাচার-ব্যভিচার থেকে নিরাশ রেখেছে। আর সমাজসভ্যতাকে করে তুলেছে পূতপবিত্র। কাজেই পর্দাব্যবস্থা মানব
মানবীর জন্য অপরিহার্য বিষয়।

فَوَائِدُ الْحِجَاب. ِ:

পর্দার উপকারিতাসমূহ: পর্দা মহান আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক বিধান, যার মাধ্যমে অতি সহজেই নারী জাতির সম্ভ্রম রক্ষা পায়। অবাধ মেলামেশায় পারস্পরিক আকর্ষণের মাধ্যমে যে সকল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, পর্দা তা থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে রক্ষা করে। সুতরাং পর্দা ফরয হওয়ার কতিপয় উপকারিতা নিম্নরূপ-

১. পর্দা যৌনতা, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতার পথ রুদ্ধ করে।

২. সমাজকে কলুষমুক্ত করে।

৩. এটি সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে।

৪. নারীর সতীত্ব রক্ষা করে।

৫. নারী জাতির মর্যাদা সংরক্ষণ করে।

৬. পুরুষকে চোখের ও মনের যেনা হতে মুক্ত রাখে।

৭. সমাজ থেকে যেনা ব্যভিচার উৎখাত করে।

৮. দাম্পত্য জীবন সুখময় করে তোলে।

৯. সুশৃঙ্খল ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করে।

উপসংহার: মহান আল্লাহ হিজাব এবং সতর উভয়টিই ফরয করে দিয়েছেন। হিজাব তথা সত্যিকার মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, হিজাব তথা পর্দা নারী পর্দা ফরয করার মাধ্যমে নারীকে অবরোধবাসিনী বানানো হয়নি: বরং নারী জাতিকে জাতির রক্ষাকবচ। মানরজাতির দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তা ও সুখশান্তি নিশ্চিত করা, সমাজে নারীঘটিত কলহবিবাদ সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করা এবং নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে যৌন অনাচার থেকে রক্ষা করার নিমিত্তই ইসলামে পর্দাপ্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে।।

[পর্দা টপিকের তথ্যসূত্র:

আল ফাতাহ ফাযিল (স্নাতক) পাস স্টাডি সিরিজ: তৃতীয় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ ৩য় পত্র]

الْمُشْكِلاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ الاجْتِمَاعِيَّة(ِ

আর্থসমাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা: আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা ব্যাপক। কেননা আর্থসামাজিক কল্যাণ সাধনই ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইসলাম গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন করে সুশীল সমাজ উপহার দিয়েছে। আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম যে ভূমিকা রেখেছে, নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

১. মানবতা ও সাম্যের সমাজ গঠন: ইসলাম সমাজ থেকে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, সাদা-কালোর বৈষম্য, উঁচুনিচুর পার্থক্য, ধনী-গরিবের ব্যবধান ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি দূর করে তার বিপরীতে মানবতাভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজ গঠন করেছে। সামাজিক বৈষম্য দূর করে ইসলাম নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ মর্মে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন- كُلُّكُمْ مِنْ أَدَمَ وَأَدَمُ مِنْ تُرَابٍ
অর্থাৎ, তোমরা সকলেই এক আদম হতে উৎসারিত আর আদম হলো মাটির তৈরি

২. আদর্শিক সমাজ গঠন: সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আরবের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন করে ইসলাম ঐশী আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী আদর্শ সমাজ গঠন করেছে। ঐতিহাসিক মাসুদী যথার্থই বলেছেন, 'মহানবী (স) নানা অনাচার, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সমস্ত সমাজকে তাওহীদের আদর্শে রূপায়িত করেন।"

৩. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা: নারীদের ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের ওপর নারীদেরও অধিকার রয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, নারীদের তুলনায় পুরুষদের দায়িত্ব একটু বেশি। ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সমাজে নারীপুরুষের সামাজিক বৈষম্য দূর করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ, তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।"

৪. বিবাপ্রথার সংস্কার: জাহেলিয়া যুগে বিবাহের ধরন ছিল ব্যভিচারমূলক। ইসলাম সে ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে শরীয়তসম্মত বিবাহের ব্যবস্থা জারি করে। ফলে সমাজ থেকে অন্যায় ব্যভিচার দূর হয়। হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স) বলেছেন, "তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, সম্ভব হলে সে যেন একবার তাকে দেখে নেয়।"

৫. দাসপ্রথার উচ্ছেদসাধন: প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরবে দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মহানবী (স) ঘৃণ্য দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। ফলে দাসেরা পেল মুক্ত জীবন। তিনি যায়েদ (রা)-কে সেনাপতি ও বেলাল (রা)-কে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করে বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "দাসদাসীরাও তোমাদের মতো মানুষ, তোমরা যা খাবে, পরবে, তাদেরকেও তা খাওয়াবে, পরাবে।"

৬. জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান: ঐতিহাসিক আমীর আলীর ভাষায়, "মহানবী (স) মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সুষ্ঠু বণ্টননীতি চালু করেন। এর ফলে সমাজের সকল মানুষ সামাজিকভাবে নিরাপত্তা লাভ করে এবং একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।" আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولو القربى واليتمى والمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا شَعْرُوفًا . অর্থাৎ, সম্পত্তি বণ্টনের সময় যখন আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর।

৭. এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা: কড় শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে। যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররে ইয়াতিম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায়, যে শিশুসন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে এতিম বলা হয়ে থাকে; তবে ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় এতিম বলা হয় না। ইসলাম এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَنمى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيدا.
অর্থাৎ, যারা এতিমদের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

৮. প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠা: প্রতিবেশীর সাথে অপর প্রতিবেশীর সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রত্যেক প্রতিবেশীর উচিত অপর প্রতিবেশীর সুবিধা অসুবিধাগুলো লক্ষ্য রাখা। মহানবী (স) ঘোষণা করেন, "সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয় যার হাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। সুতরাং প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা সকল প্রতিবেশীর কর্তব্য। কেননা এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর কাছে নিরাপদ থাকলেই সমস্ত জাতি পর্যায়ক্রমে নিরাপদ থাকবে।

৯. আত্মীয়স্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠা:
": আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাসের পর্যবেক্ষণ করা এবং অসহায় আত্মীয়দের সাহায্য করা সকধ সচ্ছল আত্মীয়ের কর্তব্য। যে ব্যক্তি নিজে পেটপুরে খায় অথচ তার আত্মায় এবং সুবিধা অসুবিধাগুলো পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে, সে ব্যাক্ত মুমিন হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয়) দাবি করে গার এবং আত্মীয়তা (বিনট করা) হতো কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন।

১০.গোত্রীয় কলহের অবসান:

কলহ, জুলুম, অত্যাচার আল্লাহ তায়ালার নিকট একটা ঘৃণ্য বিষয়। আল্লাহ তায়ালা এটাকে কখনোই বরদাশত করেন না। তাই বলা হয়েছে জোরজবরদস্তি করে সামান্য পরিমাণ জমিও যদি কেউ আত্মত্মসাৎ করে, তবে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। বিচার দিবসে এর কঠিন শাস্তি হবে। মহানবী (স) ইসলামের সামাজিক কল্যাণের প্রেক্ষিতে কঠোর হস্তক্ষেপ করেন। সম্পত্তি নিয়ে গোত্রীয় কলহের অবসানের জন্য তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ثنا السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم.

অর্থাৎ, অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১১. মদ্যপান রহিতকরণ: জাহেলিয়া যুগে মদ্যপান ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। ছোট বড় সকলেই ইচ্ছামতো মদ্যপান করত। ইসলামী সমাজ গঠনের পর মহানবী (স) সমাজ থেকে সকল প্রকার মদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আর এর অপকারিতাও মানুষকে জানিয়ে, দিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

بَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون. َ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ। মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারি সবই শয়তানের কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্যলাভ করতে পারবে। সুতরাং দেখা যায়, মদ্যপায়ী সমাজে রেষারেষি বিদ্যমান, পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

১২. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা: বিশ্বে সকল ক্ষমতার ঊর্ধ্বে রয়েছে মহান আল্লাহর ক্ষমতা। আল্লাহ হচ্ছেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং জগতে সর্বজনীন, স্থিতিশীল ও শাশ্বত চিরন্তন আইন হলো আল্লাহর আইন। মানুষের মনগড়া মতবাদ কোনো অধিকারভিত্তিক আইন নয়। মানুষ মূলত স্বার্থের জন্য আইন করে। আর আল্লাহর আইন সকলের মঙ্গলের জন্য নির্ধারিত। ইসলাম মানুষকে সামাজিক কল্যাণের প্রেক্ষিতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী জীবনব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. অর্থাৎ, আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা ফয়সালা করবে, তখন সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা ভালো কাজের উপদেশ দিচ্ছেন।

উপসংহার: Islam is not only a Religion; but also a complete code of life. ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত শান্তিময় এক জীবন বিধান। যখন মানুষ জাহেলিয়াতের কুহেলিকা পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং খুন, রাহাজানি, দাঙ্গাহাঙ্গামা ছিল যেই সমাজের নিত্য সাথি, সেই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে ইসলাম উপহার দিয়েছে শান্তিময় এক সোনালি সমাজ।

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা:

আল্লাহ তায়ালার নিকট। মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। এটা ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম জীবনবিধান হিসেবে তাঁর কাছে গ্রহণীয় ومن يبتغ غير الاسلام بينا فلن يقبل منه অর্থাৎ, আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মকে দীন হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণীয় হবে না। তথাপি যেসব ধর্ম ধর্ম হিসেবে পরিচিত, তাদের মধ্যে
তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-ইসলাম ব্যতীত যেসব ধর্ম ধর্ম হিসেবে পরিচিত: ইসলাম হলো আল্লাহর মনোনীত
একমাত্র দীন। এছাড়াও যেসব ধর্ম ধর্ম হিসেবে পরিচিত, তা হলো- ১. ইহুদি ধর্ম, ২. খ্রিস্ট ধর্ম, ৩. বৌদ্ধ ধর্ম, ৪. হিন্দু ধর্ম। নিম্নে এ ধর্মসমূহের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো-

১. ইহুদি ধর্ম: বাইবেলের দুটো রূপের একটি রূপ হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্ট। এটি তাওরাত ও যবুরের বিকৃত রূপ। তাওরাত ও যবুরের মূলভাব, ভাষা ও বিষয় প্রেক্ষাপট অনেকাংশে বিলুপ্ত। এটি ইহুদি মতাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ। কথিত এ ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুসা (আ)-কে বলা হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এ তাওরাত গ্রন্থ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে রচিত। তা হলো- ১. তাওরাত ২. আম্বিয়ায়ে কেরামের সহীফাসমূহ ৩. পবিত্র সহীফাসমূহ। এ ধর্মগ্রন্থে আল্লাহকে 'জিহ্ববা' বলা হয়েছে।
এদের বিশ্বাস হলো-
ক. তারাই জিহুবার মনোনীত বিশেষ জাতি।
খ. পরকালে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

গ. তাদের সাথে জিহ্বার এক বিশেষ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন।
ঘ. কেউ কেউ হযরত উযাইর (আ)-কে জিহুবার (আল্লাহর) পুত্র বলে মনে করে।

২. খ্রিস্ট ধর্ম: পৃথিবীর অন্যতম ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্ম। এ ধর্ম মতাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের নাম নিউ টেস্টামেন্ট। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীতে এটি রচিত হয়। এদের চারটি পুস্তিকা।রয়েছে। যথা- মথি, মার্ক, লুক ও যোহন। এ ধর্মগ্রন্থের ভাষা সুরিয়ানী। কথিত ইঞ্জিলকে তারা নিউ টেস্টামেন্ট নামে অভিহিত করে। তাদের ধর্মগ্রন্থ মতে, আল্লাহ হচ্ছেন 'গড' তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এছাড়া তাদের বিশ্বাস হলো-
ক. খ্রিস্ট হচ্ছে গডের দৃশ্যমান রূপ।
খ. ঈসা (আ)-কে তারা যীশু ও মারইয়াম (আ)-কে মেরী বলে অভিহিত করে। সে মতে যিশু গড়ের পুত্র এবং মেরী গড়ের স্ত্রী।
যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।
ঘ. বিচর পথই একমার মুক্তির পথ।

৩. বৌদ্ধ ধর্ম: বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ এ ধর্মের প্রবর্তক। বৌদ্ধ ধর্ম মতাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক পালি পালি ভাষায় রচিত। এরা আজ্ঞেয়বাদী ও নিরেশ্বরবাদী হিসেবে পরিচিত। ত্রিপিটক থেরবাদী বা হীনযানীদের ধর্মীয় গ্রন্থ ও মহাযানসূত্র মহাযানীদের গ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্মে মহাধানসূত্রকেই মৌলিক গ্রন্থ বলা হয়েছে। ত্রিপিটক তিন খণ্ডে বিন্যস্ত। যথা-
১. বিময় পিটক ২. সুত্তপিটক ও ৩. অভিধম্মপিটক।
অহিংসা এদের পরম ধর্ম। এ ধর্মগ্রন্থে পশু হত্যাকে মহাপাপ বলা হয়েছে। এ কারণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীবও যাতে অসাবধানতাবশত প্রাণ না হারায় সেজন্য পরদ্রব্য অপহরণ করবে না, মৃধাবাক্য (কর্কশ বাক্য, কঠোর বাক্য, নিন্দা বাক্য, চুগলি বাক্য, অসত্য যাক্য) বলবে না, কামের (ব্যভিচার) বশীভূত হবে না এবং সুরা পান করবে না।
ত্রিপিটকের ভাষ্য মতে, আত্মা বলতে কিছু নেই। তাই বৌদ্ধরা নৈবাত্মায় বিশ্বাসী। এদের দর্শন হলো আত্মা পরিবর্তনশীল দৈহিক ও মানসিক উপাদানের সমষ্টি। আত্মা দেহ-মন, চিন্তা-বুদ্ধি, ইচ্ছা-অনুভূতি প্রভৃতি থেকে ভিন্নতর কোনো সত্তা নয়; বরং এটি নিত্যপরিবর্তনশীল মনো দৈহিক প্রক্রিয়ার জটিল ক্রমধারা। এ মতে জীব পঞ্চস্কন্ধের সমাটি। তা হলো- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। মৃত্যুর সাথেই স্কন্ধগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীবের কর্ম তৎক্ষণাৎ নতুন স্কন্ধ উৎপাদন করে লোকান্তরে নবজীবন লাভ করে।

৪. হিন্দু ধর্ম: হিন্দু ধর্ম মতাবলম্বীদের ধর্মীয় গ্রন্থ হলো বেদ। এর অপর নাম শ্রুতি। বেদের সংখ্যা চারটি। যথা- ঋকবেদ, সামবেদ, যজুবেদ, অথর্ববেদ। এগুলোর আবার চারটি উপবেদ আছে। তা হলো- আয়ুর্বেদ, ধনুবেদ, গন্ধকবেদ ও অর্থশাস্ত্র। পুরান, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ এসবই বেদের শাখা উপশাখা। এ ধর্মে একেশ্বরবাদের ধারণা যেমনি আছে তেমনি বহু ঈশ্বরবাদ, বহু দেবতাবাদ, অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ ও প্রকৃতিবাদ রয়েছে। হিন্দু ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট প্রবর্তক নেই। তাদের মতে রাসূলের কোনো প্রয়োজন নেই বলে তাদের আকলই রাসূল। হিন্দুদের ত্রিত্ববাদ অনুযায়ী ৩টি সত্তা রয়েছে। যথা- ব্রহ্ম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হচ্ছে পালনকর্তা, শিব হচ্ছে সংহারকর্তা।
হিন্দু-ধর্ম মতে, আত্মা শাশ্বত, নিত্য, নিন্ময় ও অবিনাশী। দেহ নশ্বর ও বিনাশগ্রস্ত। দেহ লয়প্রাপ্ত হলেও আত্মার ক্ষয় নেই। গীতায় বলা হয়েছে, শাস্ত্র সকল একে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, জল ভিজাতে পারে না, এ আত্মা এচ্ছেনা, অদাহ্য ও অক্রেদ্য অশ্লেষণ।

৫ . ইসলাম ধর্ম: ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম। এর প্রবর্তক হচ্ছেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এবং পথপ্রদর্শক হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (স)। কুরআনুল কারীমের মূল বিষয় হলো ভাওহীদ বা একত্ববাদ। সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এ মালিকানায় কারো কোনো অংশীদার নেই। মহান আল্লাহ تَبٰرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير তিনি, যার যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানে আল্লাহ বলেন-

الدين له ملك السموات والأرض ولم يتجه وَلَنَا وَلَمْ يَكُن لَّشَرِيكٌ فِي الملك وخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.

অর্থাৎ, যিনি আসমান ও যমীনের মালিক। তিনি কোনো সন্তানগ্রহণ করেননি এবং তাঁর বাজতেও কোনো অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাঁকে সঠিকভাবে পরিমিত করেছেন।
মধ্যস্থতাকারী ধারণা অলীক মাত্র। আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকার নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন -
“ যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে ওরাল বলেছে যে আমরা তাদের পূজা করি এজনা যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেটে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যকার মতবিরোধের চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। যারা মিথ্যাবর্ম তাদের আল্লাহ হেদায়াত করেন না।”

আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অন্য কারো ইবাদতের প্রয়োজন হয় না। ইসলাম দেবদেবীদের ইবাদতকে অসার বলেছে। আল্লাহ তায়ালা তায়ালা বলেন-

" আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগি কর, তারা কয়েকটি নাম ছাড় কিছুই নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখে গেছ। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কোনো দলীল অবতীর্ণ করেননি।"

যারা প্রকৃতি পূজা করে তাদের ধারণাও মিথ্যা। আল্লাহ এগুলো নিষেধ করে বলেন- لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ অর্থাৎ," তোমরা চন্দ্র ও সূর্যকে সেজদা করো না; বরং তোমরা সেজদা কর আল্লাহকে।যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যারা আল্লাহর পরিবার (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) থাকার ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহ এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْطنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُون. অর্থাৎ, "তারা বলে, রহমান (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি অতি পবিত্র আয় ফেরেশতারা তাঁর সম্মানিত বান্দা মাত্র।"

অন্যস্থানে আল্লাহ বলেন,

"তোমরা দু'ইলাহ বানাবে না; বরং ইলাহ মাত্র একজন।" অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে মারইয়ামের পুত্র মসীহই আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ بن مريم

وَقالت اليهود والنصري نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَق. অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়জন। তবে বল কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য শাস্তি দেন; বরং তোমরা অন্যান্য সৃষ্ট মানবো অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ।

এসব বিষয় সূরা ইখলাসে আরো সুন্দর করে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد. অর্থাৎ, বল আল্লাহ একক তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সন্তান জন্ম দেন না এবং তিনিও কারো সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

উপসংহার: সুতরাং ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম অসার, অলীক ও মিথ্যা। তবে তাদের ধর্মগ্রন্থে যে সকল পুণ্যের কথা আছে, তার প্রতিফল তারা পৃথিবীতেই লাভ করবে। পরকালে তারা কিছুই পাবে না। পক্ষান্তরে যারা কুরআনের বিধান পালন করবে, তারা পৃথিবীতে ও পরকালে উভয় স্থানে সুখী থাকবে। কেননা, ইসলামই একমাত্র দীন, যা সর্বপ্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত।
[তথ্যসূত্র :আল ফাতাহ গাইড ফাযিল (ডিগ্রি),৩য় বর্ষ-আল ফাতাহ সিরিজ]

افضلية الاسلام:

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব: ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. ইসলামের পরিচয়: 'ইসলাম' শব্দটি আরবি 'সলম' ধাতু থেকে উৎপত্তিলাভ করেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- আত্মসমর্পণ করা, মেনে নেয়া, আনুগত্য করা। আর পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা।

২. পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা: ইসলাম বিশ্ববাসীর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যেখানে ইসলামের দৃপ্ত ও সমাধানপূর্ণ পদচারণ
নেই। তাই কুরআনে বলা হয়েছে- إن الدين عند الله الإسلام, অর্থাৎ, ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক তথা সকল দিকেই ইসলাম এক অতুলনীয় আদর্শ উপস্থাপন করেছে।

৩.শোষণমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায়: অর্থনীতি মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দিক। এ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ইসলাম ইনসাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনী দরিদ্রের মাঝে সহাবস্থানের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক ইসলামী অর্থনীতির ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন- The Muslim economic system seems to have a great ment the western world should study it. Perhaps to adopt it in a whole or in a part.

৪. সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম বর্ণ, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিয়েছে। রাসূল (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণই তার

সুস্পষ্ট দলীল। অথচ আজ বিশ্বের দিকে দিকে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। যেমন বসনিয়ায় নির্বিচারে গণহত্যা, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, মিসর, আরাকান ও কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের ওপর নির্যাতন, আলজেরিয়ায় ইসলামের পক্ষে জনতার বিপুল রায় সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। অতিসম্প্রতি মিসরে জোরপূর্বক ইসলামপন্থিদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। মূলত ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণেই বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার চরমভাবে লজ্জিত হচ্ছে। ইসলাম ধর্মমতের ঊর্ধ্বে সকলের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

৫. ইসলাম ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা: বিশ্বদ্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রেম ও আনুগত্য থাকলেই সমগ্র সৃষ্টিকে ভালোবাসা যায়। ইংরেজি প্রবাদে আছে- To love man is to love God. মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সাধনার্থে সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও তার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। এতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শক্তি ও কল্যাণের শাসন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-
"চারদিকে সম্মুখ ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।"

৬. ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার ইসলামের দৃষ্টিতে পাশাপাশি বসবাসকারী চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত জনগোষ্ঠির সকলেই প্রতিবেশী। ইসলামী সমাজে একজন প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর আমানতস্বরূপ। বিপদাপদে সাহায্য করবে, অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবা-শুশ্রুষা করবে, তার উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে কল্যাণ কামনা করবে- এটাই অপর ভাইয়ের আমানত। যদি একজন প্রতিবেশী এসব দায়িত্ব যথাযথ পালন করে, তাহলে সমাজজীবনে অশান্তি থাকতে পারে না।

৭. ইসলামে শান্তির ধারণা: ইসলাম অর্থ শান্তি। এটি একটি মৌলিক ও ব্যাপকভিত্তিক ধারণা। দীন ইসলামের প্রকৃতির সাথে শান্তির ধারণা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পথহারা, শান্তিহারা মানবজাতিকে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আহ্বান করেছেন।

৮. ইসলাম মানেই শান্তি: ইসলাম হলো অনুপম শান্তি ও প্রেমের ধর্ম। ইসলাম অন্যকে ভালোবাসতে শেখায় এবং মানবপ্রীতি, সমাজপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত

করে। ফলে সমাজ থেকে সকল অশান্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি দূরীভূত হয়।

৯. অধিকারহারা মানুষের কল্যাণে ইসলাম ইসলামই মানুষকে উত্তমরূপে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। মহানবী (স) যখন এ পৃথিবীর বুকে আগমন করেন তখন সাধারণ মানুষ ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অধিকারহারা। এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে মহানবী (স) মানুষের দুঃখ লাঘব ও বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণে উপস্থাপন করলেন ন্যায়নীতির এক আদর্শ ধর্ম ইসলাম।

১০. বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ বড়দের প্রতি সম্মান আর ছোটদের। প্রতি হে প্রদর্শন ইসলাম অবশ্য কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। মহানবী (স) বলেন, যে বড়কে সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমার উম্মত নয়।

১১. বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: ইসলামই পৃথিবীতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সূচনা করে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।" ধনীগরিব, রাজাপ্রজা, উঁচুনিচুর ভেদাভেদ ধূলিসাৎ করে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষের মাঝে মানবতাবোধের ধারণা দেয়। তাই ইসলামের এ মানবতাবোধ
লক্ষ্য করে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন-"ইসলামে নাই আশরাফ আতরাফ, এই ভেদজ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে, কর মিসমার সাফ।"

১২. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না। নারী পণ্যের মতো বিক্রয় হতো, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। আর সে সমাজেই রাসূল (স) সর্বপ্রথম নারীকে উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা ও যথাযথ অধিকার প্রদান করেন।

১৩. সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: ইসলাম সাম্য ও ন্যায়ের ধর্ম। পরিপূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতে ইসলাম সমাজে কল্যাণকর শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই কুরআনের ঘোষণা, "তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে বিচার অথবা আপসরফা কর তখন ন্যায়ের সাথে কর।"

উপসংহার: ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণের ধর্ম। মানবকল্যাণের যতগুলো বাস্তব দিক আছে সবগুলোই ইসলামে উপস্থিত। তাই সেই কল্যাণ ও সাফল্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেই মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে-
এই ধরাতে আসবে সুদিন সাজবে ধরা নবসাজে এই ধরাতে কায়েম হবে ফের খোদার বিধান
এ সমাজে ঘুচবে সেদিন দুঃখবেদনা আসবে শান্তির জোয়ার।

[ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তথ্যসূত্র :আল ফাতাহ সিরিজ, ইসলামিক স্টাডিজ ৩য় পত্র,৩য়বর্ষ ২০২৪]

"ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।'

উপস্থাপনা: Islam is the complete code of life.ইসলামে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধীন বিদ্যমান। এ সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নরূপ-
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা: ইসলাম একটি পর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে রয়েছে-

১ . জীবনের নিরাপত্তা বিধান: মানুষের নিকট জীবন অত্যন্ত প্রিয় ও অমূল্য সম্পন্ন জীবনের নিরাপত্তাহীনতা সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই ইসলাম সকল প্রকা বাস্তব জীবনে মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর মাধ্যমে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- إِمَّا كَانَ لِمُؤْمِن آن بقتل مؤمنا إلا حناء অর্থাৎ কোনো মুমিনের অপর কোনো মুমিনকে হত্যা করা কোনো অধিকার নেই, ভবে ভুলবশত হলে সেটা ভিন্ন কথা। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ অর্থাৎ, ফেতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।

২ . সম্পদের নিরাপত্তা বিধান: মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য সম্প অপরিহার্য। এর নিরাপত্তাহীনতায় সমাজজীবনে নেমে আসে অশান্তি ও অরাজকতা।। তাই ইসলাম সম্পদ আয় ও ব্যয়ের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করে এর নিরাপত্তা বিধান করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

إِنَّ الَّذِينَঅর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা অবৈধভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتْمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا.

অর্থাৎ, যারা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা যেন তাদের উদর অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করে।

৩. সম্ভ্রলের নিরাপত্তা বিধান: একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সে জাতির সম্ভ্রমের নিরাপত্তার ওপর। ইসলাম ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- وَلَا تَقْرَبُوا الزنى কেননা এটি জঘন্য কাজ আর তা কতই না নিকৃষ্ট পথ। إِنَّ كَانَ فاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا অর্থাৎ তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না।

রাসূল (স) ইরশাদ করেন- ـّمَنْ لَمْ يُرْحَمُ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِن অর্থাৎ, যে ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।

৪. ব্যক্তি ও পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা: একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে শান্তির অমিয়ধারা প্রবাহিত করতে কিছু বাস্তবসম্মত জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যার পূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

অর্থাৎ, "তোমরা নিজে বাঁচ ও পরিবার পরিজনকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে। "

স্ত্রীদের ব্যপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ـّمن لباس لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن . অর্থাৎ," তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ এবং ভোমরা তাদের ভূষণ।"

অর্থাৎ, সদাচরণের সাথে তোমরা তাদেরকে নিয়ে বসবাস কর। এ মর্মে রাসূল (স)-এর বাদী نائية في الاسلام; অর্থাৎ, ইসলামে বৈরাগা সাধনের কোনো অবকাশ নেই।

৫.

সামাজিক নিরাপত্তা বিধান: সবধরনের অন্যায় অশ্লীলতার মূলোচ্ছেদ করে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম বদ্ধপরিকর। এজন্যই সামাজিক শান্তিতে বিঘ্ন মরিকারীর অন্যায় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির বিধান ইসলামে রয়েছে। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- অর্থাৎ," নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। "

ইসলামে বলা হয়-

"চোর পুরুষ ও চোর নারী উভয়ের হাত কেটে দাও।"

এছাড়াও

কেউ ব্যাভিচারে লিপ্ত প্রমাণিত হলে ইসলামের শাস্তি ব্যভিচারিণী এবং ব্যভিচারী উভয়কেই একশত বেত্রদণ্ড প্রদান করা।

৬ . অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান মানুষের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অর্থনীতি। ইসলাম বৈষম্যহীন, দারিদ্র্যমুক্ত ও সর্বজনীন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-
অর্থাৎ, "তোমাদের সম্পদশালীদের সম্পদে রয়েছে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার।"

৭. জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান: কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি সে দেশের স্থিতিশীলতা ও জাতীয় ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। । আর আর ইসলামই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধানের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা।
কুরআনে বলা হয়েছে-
"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। "

৮. আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা: ইসলাম কেবল জাতীয় সমস্যারই সমাধান দেয়নি। বরং জাতীয় সমস্যার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে। يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا خَلَقْنَكُمْ من ذكر وأنثى.
ْإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم . অর্থাৎ, নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর।
ِيأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَة . অর্থাৎ, হে মানবজাতি। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

* ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: ন্যায়ের অভাব অন্যায়ের উদ্দীপক। তাই সমাজজীবনে যাতে অন্যায় অবিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-
َفَاسْتَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين . অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ। তোমরা নিজেদের মধ্যে ন্যায়নীতির সাথে সন্ধি স্থাপন কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালোবাসেন

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও ইহসানের নির্দেশ দিয়েছেন।

ان اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.

অর্থাৎ, ন্যায়বিচার কর, তা হলো ভাকওয়ার অতি সন্নিকটবর্তী।

১০. আত্মিক প্রশান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি: ইহলৌকিক জীবনের আত্মিক প্রশান্তি ও পারলৌকিক জীবনের মুক্তিই মানবজীবনের পরম চাওয়া। আর একমাত্র ইসলামই মানুষের জন্য এমন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার পূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে উল্লিখিত দুটি শখই সুখকর ও কল্যাণকর হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

"নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁর ইবাদত কর, আর এটাই সহজ সরল পথ।"

এছাড়াও বলা হয়েছে-

" জেনে রেখ। আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়ের প্রশান্তি।"

১১. কর্মে উৎসাহদান: আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন, কাজ করার জন্য দিয়েছেন হাত-পা, আর কর্মস্থল হিসেবে দিয়েছেন বিপুল নেয়ামতসমৃদ্ধ এ বিশাল পৃথিবী। এতকিছুর ব্যবস্থ ব্যবস্থা করেই আল্লাহ শ্রমের বিনিময়ে নেয়া উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-নেয়ামত অর্জনের জন্য

فإذا قضيت الصلوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه . অর্থাৎ, নামাযান্তে যমীনে ছড়িয়ে পড়। অতঃপর আল্লাহর কল্যাণ সন্ধান কর।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم ٢. অর্থাৎ, আল্লাহ ততক্ষণ কোনো জাতির ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটান না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাতে সচেষ্ট হয়।

১২. শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ: শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া মানুষ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর ন্যায়। তাই মানুষকে তার নিজ আসনে সমাসীন করার লক্ষ্যে ইসলাম সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خلق

অর্থাৎ, পড়। তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

১৩. মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান: ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিয়েছে। রাসূল (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণই তার সুস্পষ্ট দলীল। অথচ আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। যেমন বসনিয়ায়

নির্বিচারে গণহত্যা, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের ওপর নির্যাতন, আলজেরিয়ায় ইসলামের পক্ষে জনতার বিপুল রায় সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া দেয়া হয়নি। অফি অতিসম্প্রতি মিসরে ইসলামপন্থিদেরকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। মূলত ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণেই বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

১৪. ধর্মীয় স্বাধীনতা: ইসলাম সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে। মহানবী (স) মদিনা সনদে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি ইহুদি, খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন لا إكْرَاه فِي الدين অর্থাৎ, ধর্মীয় ব্যপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই।

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট যে, নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি সর্বজনীন, শান্তি ও প্রগতির ধর্ম। ইসলামের বিধানসমূহ শুধু মুসলমানের জন্য দিকনির্দেশনা দেয়নি; বরং সর্বজনীন দিকনির্দেশনা ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান প্রদান করে। তাই মানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্য ইসলামের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অনিবার্য ও অপরিহার্য।

[ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এই টপিকের [তথ্যসূত্র:.
ইসলামিক স্টাডিজ তৃতীয় পত্র
(ঐচ্ছিক)ফাযিল (স্নাতক) পাস: তৃতীয় বর্ষ-২০২৪
গ্রন্থনা: মাওলানা মোঃ মোহিব্বুল্লাহ আজাদ,
মাওলানা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম,
মাওলানা মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন।
সম্পাদনা:আল ফাতাহ সম্পাদনা পর্ষদ]

স্বাস্থ্য সচেতনতায় ইসলাম:

বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণা করে জানতে পেরেছেন, টানা একমাস রোজা করলে (রমজান মাসে)অটোফেগির মাধ্যমে শরীরের ক্যান্সার কোষগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।
এছাড়াও
যারা পরিচ্ছন্ন থাকতে চান বা স্বাস্থ্যকর জীবন চান তারা

ইসলাম অনুযায়ী পেটের ক্ষুধাকে ৩ ভাগ করে ১ ভাগ খাবার, ১ ভাগ পানি, ১ ভাগ ফাকা রেখে খাবেন।
সপ্তাহে ২ টা রোজা রাখবেন,সোমবার ও বৃহস্পতিবার।
আরবি মাসের ১৩,১৪,১৫ এই তিনদিন রোজা রাখবেন।
সাথে রোজ ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন।
মেসওয়াক করবেন, ওযু করবেন ৫ বার।
ব্যস।
সুন্নাহ মানার সাথে সাথে ডায়েটও হয়ে গেলো।ব্যায়ামও হয়ে গেল। ভোরে নামাজের জন্য উঠে সকালের ফ্রেশ হাওয়াও নিলেন। ওওযুর মাধ্যমে দেহও পরিচ্ছন্ন থাকলো।
ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।
যদিও রোগ হলে চিকিৎসা নেওয়া সুন্নাহ, তবুও
নবীজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনের নিয়মকানুন (সুন্নাহ/সীরাত) মানলে বাড়তি কোনো ডায়েটিশিয়ান এর কাছে যাওয়া বা এক্সট্রা খরচ লাগেনা জীবনে।

আল কুরআন থেকে কিছু কথা -

আমরা বর্তমানে বিজ্ঞানের সুবাদে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সম্পর্কে জানতে পারছি অথচ আল কুরআনে ১৪০০ বছর আগেই আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদ এ বলেছেন-
“মানুষ কি মনে করে আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?
কেন নয়? আমি তো তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। “[সুরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩,৪]

কুরআনে বলা হয়েছে, [[আল্লাহ তায়ালা কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

ইসলামে আরো বলা হয়েছে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, ইনসাফ করতে।

কুরআন নিষেধ করা হয়েছে অত্যাচারিত হতে বা অত্যাচার করতে।

কুরআনের স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করতে বলা হয়েছে।

কুরআনের দম্ভ ভরে জমিনে চলাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

কোনরকম খুঁটি ছাড়া আকাশ আমাদের উপরে ছাদের মত হয়ে আছে তা কুরআনে বলা হয়েছে।

এছাড়াও ইসলামে উটের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে উট নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যে উট এর ভিতর অনেক রহস্যময় বিষয় পাওয়া গেছে।

এছাড়াও কুরআনে বলা হয়েছে দুই নদীর পরস্পর পাশাপাশি চলার কথা বলা হয়েছে যারা একে অপরের সাথে কখনো মিলিত হয় না।

এছাড়াও কারো ঘরে প্রবেশ এর সময় সালাম দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইসলামে গীবত বা পরচর্চা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ইসলামে বলা হয়েছে জান্নাত জাহান্নাম সত্য, পরকাল সত্য, পরকালের বিচার দিবস সত্য।

কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে সেই সফল।

এছাড়াও কুরআনে ধৈর্য ও সালাতের সাথে সাহায্য প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-
“বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই জানেন। যারা ভ্রান্ত বিষয়ে ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”
[সুরা আনকাবুত থেকে]

প্রিয় ভাই বোন আমার আল্লাহ তায়ালার রাগের চেয়ে দয়ার পরিমাণ বেশি। **তিনি তওবাহ কারী কে ভালবাসেন।**

ইসলামে বলা হয় "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।" শারীরিক পবিত্রতা এবং আত্মিক পবিত্রতা দুটো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয় ভাই বোন, আসুন, নিজেদের আত্মাকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে বাঁচিয়ে রাখি এবং তাওহীদকে মেনে নেয়ার মাধ্যমে নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করি। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিন। আমিন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন এ বলেন-
"এবং তারা (ইয়াহুদী ও নাসারাগণ) বলে, জান্নাতে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ ছাড়া অন্য কেউ কখনও প্রবেশ করবে না। এসব তাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। আপনি তাদেরকে বলে দিন তোমরা যদি (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"
[সুরা বাকারহ থেকে]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:
"ইয়াহুদীরা বলে, খ্রিস্টানদের (ধর্মের) কোনও ভিত্তি নেই এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইয়াহুদীদের (ধর্মের) কোনও ভিত্তি নেই। অথচ এরা সকলে (আসমানী) কিতাব পড়ে। অনুরূপ (সেই মুশরিকগণ) যাদের কোনও (আসমানী) জ্ঞান নেই, তারাও এদের (কিতাবীদের) মত কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফায়সালা করবেন।"
[সুরা বাকারাহ'র থেকে]

"তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, (অথচ) তাঁর সত্তা (এ জাতীয় জিনিস থেকে) পবিত্র; বরং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর অনুগত।"
[সুরাহ বাকারাহ থেকে]

কুরআন মাজীদে সূরা ইখলাস এ আল্লাহ তাআলা বলেন -

"বলে দাও, আল্লাহ সব দিক থেকে এক।
আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।
তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন।

এবং তার সমকক্ষ নয় কেউ।"
[আল কুরআন থেকে সুরাহ ইখলাস, আয়াত ১-৪]

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদ এ বলেছেন-
" যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে, তার কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং কোনও অন্যায়েরও না।"
[তথ্যসূত্র:আল কুরআন,সুরা আল জ্বিন থেকে।
মুসলিম বাংলা এন্স এর টাইপ করা তাফসীর।]

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদ এ আরোও বলেছেন-
" যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা হেদায়েতের পথ খুঁজে নিয়েছে।বাকি থাকল জালেমগণ, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।"
[আল কুরআন,সুরা আল জ্বিন থেকে]

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরও বলছেন-
"সিজদাসমূহ আল্লাহরই প্রাপ্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করো না।"
[আল কুরআন,সুরা আল জ্বিন থেকে]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-
"তবে কি তাদের জন্য এটা (অর্থাৎ এই নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে? নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক বিশ্বাস করে তাদের জন্য এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ।"
[সুরা আনকাবুত থেকে]

আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে আরো বলছেন-
"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দসমূহ তাদের থেকে মিটিয়ে দেব এবং তারা যা করছে তার উৎকৃষ্টতম প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই দেব।"

ইসলামের (কুরআন, হাদীস, সুন্নাত,সীরাত এ)আরো অসংখ্য বিষয় আছে একবারে বলা বলে শেষ করা সম্ভব নয় এই আল কুরআন কোন কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে এবং কুরআন সত্য। এর প্রতিটি বাণী আল্লাহর তরফ থেকে আসা, আল্লাহর বাণী।

সুতরাং প্রিয় ভাইবোন আমার, রবের নিকট দুয়া করুন, তিনি যেন আমাদেরকে সরল, সঠিক পথে পরিচালিত করেন । পরিচালিত করেন হেদায়েতের পথে।

প্রিয় ভাইবোন একবার ভাবুন এতগুলো বাস্তব ও পজিটিভ বিষয় কি কোনো মানুষের রচিত হতে পারে? উত্তর : না।

এটি রবের নিকট থেকে আসা ধর্ম। সুতরাং প্রিয় পাঠক ফিরে আসুন আপনার আসল ও একমাত্র স্রষ্টার নিকট, আপনার রবের নিকট এবং মেনে নিন "ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম।"